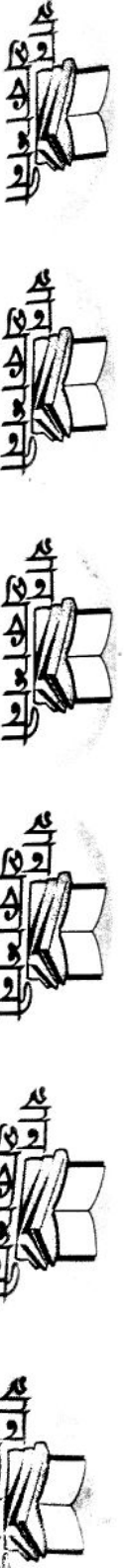
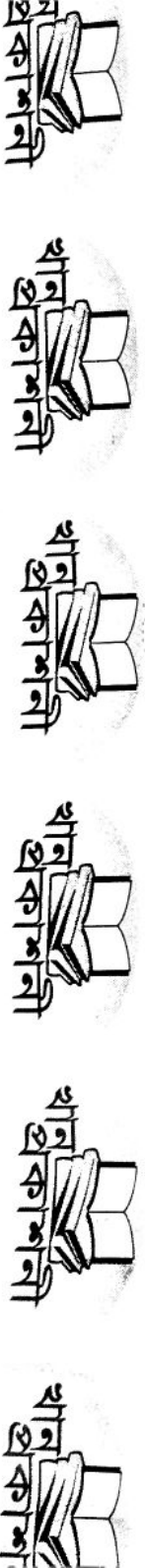
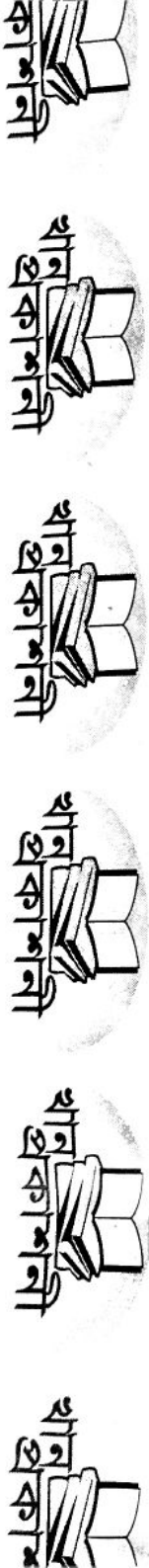
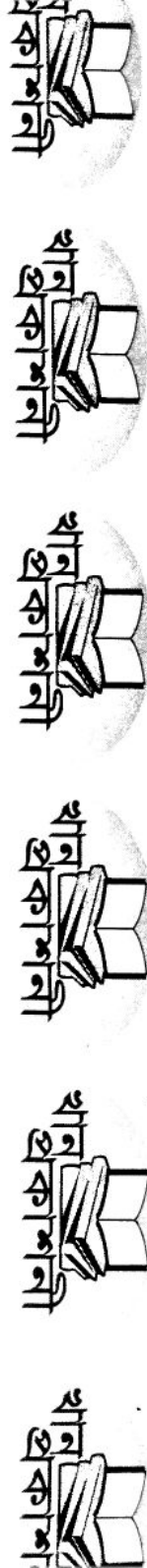


The Hereafter

জান্নাত ৩ জাহান্নাম

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান



পরকালীন জীবন, চূড়ান্ত গন্তব্য জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে অনবদ্য গ্রন্থনা

জান্নাত ও জাহান্নাম

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট

দাওরায়ে হাদীস: জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সাবেক শিক্ষক : জামিয়া আবু হুরায়রা রাযি. মিরপুর-১০ ঢাকা।

খান প্রকাশনী

(নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল ০১৭৪০১৯২৪১১, ০১৭৮১৯০৩১২৮

The Hereafter বা পরকাল সিরিজের তৃতীয় ও শেষ পর্ব-

জান্নাত ও জাহান্নাম

সংকলন ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

প্রকাশনায়: খান প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল ০১৭৪০১৯২৪১১, ০১৭৮১৯০৩১২৮

॥ সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত ॥ প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৪।

web: www.lighthouse24.org Email: ishak.khan40@gmail.com

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN-978-984-90566-5-2

মূল্য : ৩২০ (তিনশত বিশ) টাকা মাত্র

Jannat o Jahannam.

PUB: KHAN PROKASHONI. Price: 320.00 TK. 8 DOLLAR (USA).

অর্পণ

দ্বীনের জন্য যারা আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছেন,
নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াতকেই যারা নিজেদের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন
দ্বীনের সেই সকল মহান দায়ীদের উদ্দেশ্যে-

- সংকলক

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের.....
.....
.....কে
'জান্নাত ও জাহান্নাম' বইটি উপহার দিলাম।

উপহারদাতা

স্বাক্ষর

তারিখ

সূচিপত্র

কেমন ছিলেন তিনি?	০১১
জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশার মাঝেই যে জীবনের সন্তরণ.....	০১৭
পরকালের আলোচনা.....	০২৭
পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন.....	০২৯
আমাদের সবাইকেই বিচার দিবসে দাঁড়াতে হবে	০৩৪
জাহান্নামের গভীরতা	০৩৮
জাহান্নামের স্তরভেদ	০৪১
কেমন হবে জাহান্নামের উত্তাপ?	০৪৩
জাহান্নামীদের দৈহিক গঠন	০৪৬
জাহান্নামীদের খাবার	০৪৭
জাহান্নামীদের পোশাক	০৫২
চিরকাল জাহান্নামে থাকার কারণসমূহ.....	০৬৪
যারা সাময়িক সময় জাহান্নামের থাকবে	০৬৬
১. ভ্রান্ত আকীদার ফেরকাসমূহ	০৬৬
২. অযোগ্য ও দুর্নীতিপ্রায়ণ বিচারক	০৬৭
৩. মিথ্যা (জাল) হাদীস রচনাকারী	০৬৮
৪. অহংকারী (কিবর)	০৬৮
৫. হত্যাকারী	০৭০
৬. রিবা-সুদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তি	০৭১
৭. মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারী	০৭২
৮. জালিমদের সাথে একাত্মতা পোষণকারী বা সহযোগী	০৭২
৯. পোশাক পরিধান সত্ত্বেও নগ্ন মহিলা এবং চাবুকওয়ালা পুরুষ.....	০৭৩
১০. প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণকারী	০৭৪
১১. পার্থিব উদ্দেশ্যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারী	০৭৫
১২. অহেতুক বৃক্ষ নিধন	০৭৬
১৩. আত্মহত্যা	০৭৭
সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন কে?	০৭৯
এই উম্মাহর ৭০,০০০ জন	০৮১
গরীব মুহাজিরগণ	০৮২

জান্নাতে মোট ৮ টি দরজা	০৮৭
জান্নাতের দরজাসমূহ	০৮৭
৮ টি দরজা দিয়ে প্রবেশ	০৯০
যারা বিচার দিবসের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছে	০৯৪
কারা তাদের আবাসস্থল দেখতে পাবে?	০৯৬
এই উম্মত থেকে কতজন জান্নাতে যাবে	০৯৮
জান্নাতের সফর	১০৬
জান্নাতে আপনার পানীয়	১১৪
জান্নাতের বাড়ি	১৩৩
হরের সাথে সাক্ষাৎ!	১৩৪
জান্নাতের নারী-পুরুষ	১৪১
কত বড় হবে জান্নাতের সেই বাগানগুলো?	১৪৪
কিশোরদের আপ্যায়ন	১৪৪
জান্নাতের মাটি হবে মিশক	১৪৫
দুধ, মধু ও সুধার নহর	১৪৭
জান্নাতীদের পোশাক	১৫৩
জান্নাতের ফল	১৫৪
জান্নাতের পশু-পাখী	১৫৬
জান্নাতে সামাজিক সম্পর্ক	১৬৭
জাহান্নামীদের সাথে জান্নাতীদের পরস্পর কথোপকথন	১৭৩
বিবিধ বিষয়	১৮৮
জান্নাতের অবশিষ্ট বিষয়াবলী	২০৯
জান্নাতে কাদের সংখ্যা বেশি-নারী না পুরুষ	২০৯
শিশুদের কথা	২১২
মুসলিমদের শিশু সন্তান	২১২
মায়ের কি হবে	২১৩
একটি সতর্কতা	২১৪
কাফির ও মুশরিকদের সন্তানাদীর ক্ষেত্রে কি হবে?	২১৫
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত যারা	২১৭

সুসংবাদপ্রাপ্ত পুরুষ	২১৮
সুসংবাদপ্রাপ্ত নারী	২১৯
সৌভাগ্যবান দশজন	২২৪
আরো যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন	২২৬
১ হামযা রাযি.	২২৬
২ জাফর বিন আব্বি তালিব রাযি.	২২৬
৩ আবদুল্লাহ বিন সালাম রাযি.	২২৬
৪ যায়দ বিন হারিসা রাযি.	২২৭
৫ যায়দ বিন আমর রাযি.	২২৮
৭ বিলাল রাযি.	২২৮
৮ আবু দারদা রাযি.	২২৯
৬ হারিছা ইবন নুমান রাযি.	২২৯
দলগতভাবে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ	২২৯
আরও আছেন, মুহাজির সাহাবীগণ রাযি.	২২৯
জান্নাত সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ কিছু কথা-কিছু স্মরণিকা	২৩১
জান্নাত আমাদের কর্মফলের বিনিময় মূল্য নয়	২৩১
জান্নাত সংশ্লিষ্ট খুটিনাটি কয়েকটি বিষয়	২৩২
দৈহিক গঠন	২৩২
জান্নাতীদের বয়স	২৩২
ঘুম	২৩২
জান্নাত আমাদের কল্পনার বাইরে	২৩৪
জান্নাত বনাম দুনিয়া	২৩৭
জান্নাত পবিত্র, দুনিয়া কলুষিত	২৩৯
জান্নাত চিরস্থায়ী, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী	২৩৯
নার বা আগুন সম্পর্কে	২৩৯

কেমন ছিলেন তিনি?

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে বিশাল এক মসজিদ, আমেরিকার বড় বড় মসজিদসমূহের মধ্যে এটি একটি। জুমার দিনে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন হালকা পাতলা শূশ্ৰুমণ্ডিত এক খতীব। বয়সে তরুণ। শ্রোতারা তন্ময় হয়ে তাঁর কথা শুনছে। ইংরেজি সাহিত্যে অপূর্ব দক্ষতা এই তরুণের। শুধু সাহিত্যমানই নয় যেমনিভাবে তাঁর কথার মাঝে ফুটে ওঠে সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ছাপ, ঠিক তেমনি তথ্য সমৃদ্ধ, যুক্তি নির্ভর, প্রমাণসিদ্ধ ও জাদুময় তাঁর উপস্থাপনা।

তিনি হলেন একবিংশ শতাব্দীর মহান দাঈ, মুজাহিদ, শহীদুদ দাওয়াহ শায়খ আনওয়ার বিন নাসির আল আওলাকী রহ.।

তাঁর জন্ম নিউ মেক্সিকোতে। পিতা-মাতা ছিলেন ইয়েমেনী। ইয়েমেনেই তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। তিনি ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান সেখানেই অর্জন করেন। ইয়েমেনেই তাঁর জীবনের এগারো বছর কাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানে তিনি ইসলামের ওপর প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত আলেমগণের সান্নিধ্যে শরীয়াহ-র ওপর পড়াশোনা করেন। তারপর চলে আসেন আমেরিকায়।

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

অর্থ: “মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাঁরা (তাদের কৃত প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করে নি।” (সূরা আহযাব, আয়াত ২৩)

ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্ব নেন মাসজিদুল অনসারের। সাথে সাথে কলারাদো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি ডিগ্রী এবং সান ডিয়েগো ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপে এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন।

পরে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে অবস্থিত ‘দারুল হিজরাহ’ ইসলামিক সেন্টার এবং জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মুসলিম প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

কিন্তু তিনি এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে, মূলত বাস্তব জ্ঞানের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ, সে কারণে তিনি গভীরভাবে কুরআন

অধ্যয়নে লিপ্ত হন। আর তাঁর কুরআন তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তিলাওয়াতের ওপর তিনি স্বীকৃতি সনদও লাভ করেছিলেন।

তিনি শায়খ উসাইমিন রহ. প্রমুখ মক্কা মদীনার স্কলারগণের ইলমী মাজলিসেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সহীহ মুসলিম, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক রহ., ইমাম নববী রহ. এর আল মিনহাজ এবং শাফেঈ ফিকহের ওপর শায়খ আব্দুর রাহমান আহদাল এবং শায়খ হামুদ সুমাইলাহ আহদাল এর কাছে ইমাম আওলাকী রহ. গভীর পড়াশুনা করেন এবং উভয়ে তাঁকে এসব বিষয়ে ইজাজাও প্রদান করেন।

এছাড়া এসব শায়খরা ইমামকে ছয়টি হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস বর্ণনা করার, শাফি ফিকহের বিভিন্ন বই থেকে দরস প্রদান করার ইজাজা দান করেন।

এছাড়াও ইমাম আওলাকী শায়খ হাসান মাকুবুলী আহদাল এর সাথে পড়াশুনা করেছেন, ভ্রমণ করেছেন, থেকেছেন এবং শায়খ হাসান মাকুবুলী আহদাল শায়খকে ছয়টি হাদীস গ্রন্থ, বুলুগুল মারামসহ বেশ কিছু ব্যাপারে ইজাজা প্রদান করেন।

ইমাম আওলাকী কিছুদিন শায়খ সালমান ওয়াদাহর সাথেও ছিলেন। ইমাম আওলাকীর অন্যতম আরেকজন প্রিয় শিক্ষক হলেন শায়খ হুসাইন বিন মাহফুজ। ইলমী জ্ঞানার্জনে যার সাথে তিনি অনেকদিন ছিলেন। এছাড়াও শায়খ আব্দুর রহমান সুমাইলাহ আহদাল, শায়খ হামুদ সুলাইমান আহদাল প্রমুখ আরব স্কলারদের কাছ থেকেও তিনি উচ্চতর ইলম অর্জন করেন এবং তাঁরা শায়খ আওলাকী রহ. কে তাদের সনদে কুরআন, কুরআনিক বিজ্ঞান, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ এবং আরবীর ওপর অনুমতি প্রদান করেন।

ইমাম আওলাকী ২০০২ সালে ইয়েমেনের ইউনিভার্সিটি অফ ঈমানে তাফসিরের ওপর পড়াশুনা করেন। তিনি সহীহ বুখারীর দারস নেওয়ার জন্য ইয়েমেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সফর করেন এবং হাদীসের ওপর

উচ্চতর সনদ লাভ করেন। ইলমে ফিকহে তাঁর ডক্টরেট ছিল ফিকহে শাফেয়ীর ওপর।

তিনি পড়তে ভালোবাসতেন। তাফসীরের বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় তাফসীর ছিল তাফসীরে ইবনে কাসীর ও সায়্যিদ কুতুব রহ. এর তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন। হাদীসের প্রতিও ছিল তাঁর অত্যাধিক আগ্রহ।

ইবনুল কাইয়ুম রহ. এর আত্মশুদ্ধিমূলক কিতাব ‘মাদারিজুস সালেকীন’ তিনি অধ্যয়ন করতেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হতেন। এছাড়া তিনি ‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, তারিখে ইবনে কাসীর, তারিখুল ইসলামী’ ও খ্রিস্ট ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের ইলম অর্জন করতেন।

ইলম অর্জন যেন তার নেশায় পরিণত হয়েছিল। তিনি নামাজ আদায় ও জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত গ্রন্থাগার থেকে বের হতেন না। আর তিনি ইলম অর্জন করতেন আমলের জন্যই। একারণেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে অনেক মর্যাদা দান করেছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

অর্থ: “তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের মর্যাদাকে অনেক উন্নীত করবেন।” (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং ১১)

তাঁর জীবনের একটি অন্যতম অধ্যায় হলো দাওয়াহ তথা আল্লাহর দিকে আহবান। তিনি ইংরেজি এবং আরবী উভয় ভাষায় খুতবা দিতেন। তাঁর ভাষা ছিল হৃদয়স্পর্শী। বয়ানের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। পশ্চিমা বিশ্বের শত শত যুবক তাঁর বয়ানে প্রভাবিত হয়ে তাদের জীবনকে বদলে ফেলেছে। যাদের রাত কাটতো নারী ও মদ নিয়ে, আজ তাদের ঘর থেকে গভীর রাতে ভেসে আসে তিলাওয়াতের

সুর। দুনিয়াপ্রেমী এই যুবকগুলো আজ শাহাদাত পিয়াসী। তারা বদলে ফেলেছে নিজেদেরকে এবং বদলাতে চায় সারা পৃথিবীকে।

শায়খের বয়ান কাফেরদের এত অকল্পনীয় ক্ষতি করেছে, যা হয়ত তারা কখনই ভুলতে পারবে না। কেননা আজ আমেরিকা, ব্রিটেন এবং অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রে মুসলিম তরুণদের মধ্যে যে জাগরণ, তার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ শায়খ আওলাকীর ইংরেজি খুতবা। কেননা ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর শত শত বয়ান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, যা যুবকদের অন্তরে আজও আন্দোলনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তারা তাদের হারানো চেতনাকে ফিরিয়ে আনছে, নিভু নিভু ঈমানকে শাণিত করছে। ইংরেজি ভাষায় তাঁর বহুল জনপ্রিয় অডিও সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় লেকচারগুলো হলো,

Lives of the Prophets,

The Hereafter,

The Life Of Muhammad (sw),

The Life and Times of Abu Bakr (ra),

The Life and Times of Umar Bin Khattab (ra),

The story of Ibn Al- Akwa (ra),

Constants in the Path Of Jihad

-এবং আরও অনেক।

৯/১১ এরপর যখন বিশ্বব্যাপী কাফেররা মুসলমানদের ওপর জুলুম নির্যাতন করতে থাকে, তখন শায়খ মাতৃভূমি ইয়েমেনে চলে যান, যেখানে তাঁর দাওয়াহ পূর্বেই পৌঁছেছিল এবং বিভিন্ন জিহাদী কার্যক্রম চলছিল। আল্লাহর অশেষ রহমতে ইয়েমেনে তাঁর দাওয়ার কাজ যথারীতি চলতে থাকে। এতে অবিশ্বাস্য রকমের সারা পাওয়া যায় পুরো ইয়েমেনজুড়ে। কিন্তু বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ তা সহিতে পারে না। ইয়েমেন সরকারকে তারা চাপ দিতে থাকে শায়খকে গ্রেফতারের জন্য। অবশেষে শায়খের ওপর নেমে আসে সেই পরীক্ষা, যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে যুগে যুগে সত্যের দিকে আহ্বানকারীদেরকে। গ্রেফতার হলেন শায়খ। বন্দী

হলেন জালিমের কারাগারে। কারাগারে তিনি নীরবে তিলওয়াত, সালাত, কিতাব অধ্যয়নে সময় কাটাতে লাগলেন, তাই এই বন্দী দশা তাঁর ইলম ও ফিক্‌হকে আরো সমৃদ্ধ করে।

শায়খ আনওয়ারের পরিবার ছিল অনেক প্রভাবশালী। তারা সরকারকে তাঁর মুক্তির জন্য চাপ দিতে থাকে। অপরদিকে আল্লাহর অশেষ রহমতে ইয়েমেনী প্রশাসন ও মার্কিন তদন্তকারীরা তার বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়। তাই তারা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তি পেয়ে তিনি পুনরায় দাওয়াহ এবং জিহাদে মনোনিবেশ করেন এবং মুজাহিদিনরা ইয়েমেনের অনেক এলাকায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আল্লাহর বিধানই সেখানে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছিল। সেই এলাকাগুলোতে যেন শুধু আল্লাহরই দাসত্ব চলত।

এভাবেই জয়, পরাজয়, আনন্দ, বেদনা, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে সময় কাটছিল তাঁর। কিন্তু মার্কিনদের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী তা সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা সেখানে ড্রোন হামলা শুরু করে, যাতে অনেক নিরপরাধ মুসলিম হামলার শিকার হয়ে শাহাদাতের সুখা পান করেন।

একদিন রাত্রিবেলা মুজাহিদিনগণ তাদের নিজ নিজ ক্যাম্পে ছিলেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন কান ফাটা আওয়াজ। জমিন থরথর করে কেঁপে উঠলো, যেন পুরো শহরে ভূমিকম্প হলো। সবাই চিত্তিত হয়ে পড়লেন, কেননা শায়খ ক্যাম্পের বাইরে সফরে ছিলেন।

ফজরের সালাতের পর মুজাহিদিনগণ সকলেই চিত্তিত ছিলেন। হঠাৎ শায়খ সেখানে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারায় মুচকি হাসি। সবাই তাঁর হাসি দেখে বুঝতে পারলেন যে, এই আক্রমণের লক্ষ্য তিনিই ছিলেন। কিন্তু এই যাত্রায় আল্লাহর শত্রুরা ব্যর্থ হয়।

ঘটনাটি ছিল- শায়খসহ কয়েকজন মুজাহিদ গাড়িতে করে সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে তাঁরা বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাতে শায়খের গাড়ির কাঁচ ভেঙ্গে যায়। তিনি ভাবতে লাগলেন হয়ত তাঁর গাড়ির উপরই আক্রমণ হয়েছে। তিনি চালককে নির্দেশ দিলেন গাড়ি দ্রুত চালাতে, যাতে বিপদসংকুল এলাকা দ্রুত পার হওয়া যায়। তিনি তাঁর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, জনপদ থেকে দূরে ফাঁকা স্থান দিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য, যাতে মুসলমানের জান মালের কোনো ক্ষতি না হয়।

অতঃপর তাঁরা একটি উপত্যকার দিকে রওনা করেন যেখানে ঘন গাছপালা ছিল। ড্রাইভার গাড়ি থামায়। সকলে গাড়ি থেকে বের হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মার্কিন ড্রোন গাড়ির ওপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রাণে বেঁচে যান শায়খ।

কিন্তু এর কিছুদিন পর শায়খের ওপর ফের ড্রোন আক্রমণ হয় এবং এই যাত্রায় ড্রোন তাঁর প্রথম চেষ্টাতেই লক্ষ্য স্থির করে ফেলে। শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়েন শায়খ।

দিনটি ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১। পরিসমাপ্তি ঘটে ইলম, দাওয়াহ, জিহাদ, বিপ্লব ও বিদ্রোহ মিশ্রিত একটি জীবনের।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শায়খকে শহীদ হিসেব কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।
আমীন।

জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশার মাঝেই মুমিন জীবনের সন্তরণ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম ও সকল মুসলিম উম্মাহর ওপর।

মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয় বরং মৃত্যু হলো একটি জীবনের এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তরিত হওয়ার একটি সেতু মাত্র। কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা মৃত্যু সম্পর্কে এই ভুল ধারণাটি পোষণ করে থাকি যে মৃত্যু মানেই হলো জীবনের পরিসমাপ্তি।

একজন মুমিন, মুসলিমের মূল আকীদা বা বিশ্বাসের সূচনাই হচ্ছে মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ঈমান, পরকাল তথা জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদির ওপর। সুতরাং আমরা সবাই জানি যে, আমাদের এই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের পরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সীমাহীন জীবনের এক বিশাল জগত। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। যেখানে আদি আছে অন্ত নেই।

একারণেই একজন মুসলিম যেমন মহান আল্লাহর আযাব তথা জাহান্নামকে ভয় করে, তেমনি সে মহান আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতেরও প্রত্যাশা করে। জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশার মাঝেই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের বিচ্ছুরণ। যেমনটি পবিত্র কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾

অর্থ: “...আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের আযাব ভীতিকর।” (সূরা ইসরা, ১৭ আয়াত ৫৭)

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ الْأَلِيمُ
(السجدة: ٥٠-٥١)

এ কারণে পবিত্র কুরআনের শুরুতে এবং কুরআন নাযিলের প্রথম থেকে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেবল আমাদেরকে জান্নাত আর জাহান্নামের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য অগণিতবার তিনি আমাদেরকে কখনো জাহান্নামের ভয়ংকর শাস্তির কথা বলেছেন, আবার তারপরেই জান্নাতের সুশোভিত নিয়ামতসমূহের সুসংবাদ দিয়েছেন। যখনি তিনি জাহান্নামের আগুনের উত্তপ্ততার কথা বর্ণনা করেছেন, পরক্ষণেই জান্নাতের সুশীতল ঝর্ণাধারা ও হাউজে কাউসারের সুপেয় ও অলৌকিক পানীয়ের কথাও আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُخْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

অর্থ: “প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই হবে প্রকৃত সফল। আর দুনিয়ার জীবন তো শুধুই ধোঁকার সামগ্রী।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

কিন্তু বিতাড়িত শয়তান যে, আমাদের পিছনে আঁঠার মতো লেগে আছে! যে অহর্নিশ আমাদেরকে ধোঁকা ও ওয়াসওয়াসা দিয়েই চলছে যাতে আমরা কোন ভালো আমল করে জান্নাত লাভ করতে না পারি! এমনকি এক সময় আমাদের মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাচ্ছে, পরিণামে আমাদের ঠিকানা হয়ে যাচ্ছে নিকৃষ্ট জাহান্নাম। তখন আর আমাদের কিছুই করার থাকছে না।

তাই তো পরম করুণাময়, দয়াময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করে তাদের প্রকৃত ও উৎকৃষ্ট আবাসস্থলে প্রেরণের জন্য কুরআনে কারীমের অসংখ্য জায়গায় জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করেছেন। আর তিনি যেখানেই জান্নাতের আলোচনা করেছেন সাথে সাথে সেখানে জাহান্নামের আলোচনা করেছেন। জান্নাতের আলোচনা করে আমাদেরকে আশা দিয়ে নেক আমলের প্রতি উৎসাহ ও

প্রেরণা যুগিয়েছেন। সাথে সাথে জাহান্নামের ভয় ঢুকিয়ে শয়তানের প্ররোচনা, অন্যায় ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকার ভয় তৈরী করেছেন। যাতে আমরা আমলের মাধ্যমে পরকালে আমাদের উৎকৃষ্ট আবাসস্থল সহজেই লাভ করতে পারি। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

অর্থ: “আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাসস্থল হিসেবে তা খুবই নিকৃষ্ট।” (সূরা নিসা, আয়াত ১১৫)

এর কয়েক আয়াত পরেই তিনি জান্নাতের আলোচনা করেছেন।

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَغَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

অর্থ: “আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব এমন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে?” (সূরা নিসা, আয়াত ১২২)

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদীসের মধ্যে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা এসেছে। নেক আমলের বদৌলতে আমরা জান্নাতের কী কী নেয়ামত লাভ করতে পারবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য জান্নাতে কী কী নেয়ামত রেখেছেন। পক্ষান্তরে আমাদের বদ আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে কী কী শাস্তি রেখেছেন তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এটা এজন্য করা হয়েছে, মুসলিমরা শুধু আযাব আর শাস্তির কথা শুনে একদিকে যেমন হতাশ না হয়ে যায়, তেমনি অপরদিকে কেবল শাস্তি শুনে একদিকে যেমন হতাশ না হয়ে যায়, তেমনি অপরদিকে কেবল শাস্তি আর নিয়ামতের কথা শুনে শুনে তারা যেনো দুনিয়ার জীবনে অলস ও

অকর্মণ্য হয়েও না পড়ে। যেমন এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار.

অর্থ: “হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ যেদিন রাহমাত সৃষ্টি করলেন সেদিন তিনি একশত রহমত সৃষ্টি করলেন এবং তার নিরানব্বইটি রাহমাতই নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একটি রাহমাত তার সৃষ্টির সবার মাঝে দিয়েছেন। সুতরাং যদি কাফিররা মহান আল্লাহর কাছে বিদ্যমান রাহমাতের এই ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে পারতো তাহলে তারাও জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হতো না। আর যদি মুমিনরা আল্লাহর কাছে বিদ্যমান সকল আযাব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভ করতো তাহলে (আযাব ও ভয়ংকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে) তারাও জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারতো না।” (সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিক্বাক, আশা এবং ভয় পরিচ্ছেদ)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর রাহমাত যেমন বিস্তৃত, তেমনি তার আযাবও সীমাহীন। তাই আমাদের যেমন আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না, তেমনি জাহান্নামের আযাব ও মহান আল্লাহর রাগের ব্যাপারেও সজাগ থাকতে হবে এবং তার ভয়ও করতে হবে। অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي، فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم. لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف.

অর্থ: “হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মৃত্যুশয্যা শায়িত এক ব্যক্তির কাছে গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন কেমন অনুভব করছো?

তখন সেই ব্যক্তি বললেন, আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মাগফেরাত পাওয়ার আশা করি আবার আমার গুনাহের কারণে ভয়ও অনুভব করছি। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ভূমিতে মুমিন ব্যক্তির হৃদয়ে দু’টি বিষয় একত্র হতে পারে না, তবে আল্লাহ তাঁকে তাই দান করবেন সে যার আশা করে এবং তিনি তাকে সেই অবস্থা ও বিষয় থেকে রক্ষা করবেন এবং নিরাপত্তা দিবেন সে যার ভয় করে।” (তিরমিযী)

জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয়, এই দু’টি বিষয়ের মাঝে ব্যালেন্স তথা সমান অনুপাতে দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ করে চলার নামই বিচক্ষণতা। এর নামই ঈমান ও প্রকৃত মুমিনের পরিচয় এটিই।

আমাদের জীবন নামক এই ট্রেন, যা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলছে এক চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে, আর তা হলো, জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আর আমাদের প্রকৃত আবাসস্থল তো ছিলো জান্নাত। যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির পর সেখানেই রেখেছিলেন, কিন্তু বিতাড়িত শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে আমরা অপরাধ করে বসি। আমাদের সেই অপরাধ বা ভুলের কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে শাস্তিস্বরূপ এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا

فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿

অর্থ: “আর আমি বললাম, ‘হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং তা থেকে আহার করো স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী তবে এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

অতঃপর শয়তান তাঁদেরকে জান্নাত থেকে স্থলিত করলো। অতঃপর তাঁরা যাতে ছিলো তা থেকে তাঁদেরকে বের করে দিলো, আর আমি বললাম, ‘তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ।’ (সূরা বাকারা, আয়াত ৩৫-৩৬)

এখন আমাদেরকে এখানে (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) কিছুদিন অবস্থান করতে হবে এবং সেই প্রকৃত বাসস্থান ফিরে পাওয়া ও সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য আমল করতে হবে। আর সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য দু’ধরনের আবাসস্থল প্রস্তুত করে রেখেছেন। একটি হলো জান্নাত অপরটি হলো জাহান্নাম। নিশ্চয়ই জান্নাত সর্বোৎকৃষ্ট আবাসস্থল এবং জাহান্নাম নিকৃষ্ট। দুনিয়াতে আমরা যে ধরনের আমল করবো তার উপরই নির্ভর করছে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল জান্নাত হবে না জাহান্নাম হবে। এ বিষয়টি নিয়ে উম্মাহর পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামগণও চিন্তিত থাকতেন। যেমন ইমাম আবু ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল মুযনী রহ. বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী রহ. কে তাঁর মৃত্যু শয্যায় দেখতে গেলাম। তাঁর হালত জানার জন্য আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?

তিনি বললেন যে, মনে হচ্ছে আমি আমার ভাইদেরকে ছেড়ে এই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত সফর সমাপ্ত করে বিদায় নিচ্ছি। মৃত্যুর পাত্র থেকে পান করছি এবং মহান আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে, আমার সফর কি জান্নাতের দিকে হচ্ছে, না জাহান্নামের দিকে

হচ্ছে। আমি কি জান্নাতের উপযুক্ত হয়েছি, না আমার বদ আমলের কারণে জাহান্নামই আমার আবাসস্থল হবে!

এরপর তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে, চোখের পানি ফেলতে ফেলতে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন-

إِلَيْكَ إِلَهَ الْخَلْقِ أَرْفَعُ رَغْبَتِي - وَإِنْ كُنْتُ يَا ذَا الْمُنِّ وَالْجُودِ مُجْرِمًا.

হে সৃষ্টিকর্তা! আপনার কাছেই আমি আমার একান্ত বাসনা তুলে ধরি। এমনকি যদিও আমি একজন গুনাহগার ও অপরাধী হয়ে থাকি! -হে পরম দয়াশীলতা ও অসীম করুণার ধারক!

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي، وَضَاقَتْ مَذْهَبِي - جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّي لِعَفْوِكَ سُلْمًا.

যখন আমার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর আমার চলার পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

তখন আপনার মার্জনা ও ক্ষমার মাঝেই আমি আশার আলো দেখি।

فَمَا زِلْتُ ذَا عَفْوٍ عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ - تَجُودُ وَتَعْفُو مِنِّي وَتَكْرُمًا.

আপনিই একমাত্র সত্তা -যিনি গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন।

আপনার পরম ক্ষমাশীলতা ও অসীম অনুগ্রহের গুণে আপনি অনুগ্রহ ও ক্ষমা করেন।

فَإِنْ تَعَفُّ عَنِّي تَعَفُّ عَنْ مَتَمَرِدٍ - ظَلُومٍ غَشُومٍ لَا يَزَالُ مَائِمًا.

সুতরাং যদি আপনি বিচার দিবসে আমাকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি একজন পাপী ব্যক্তিকেই ক্ষমা করবেন।

-যে নিজের উপর যুলুম করেছে, এক বিদ্রোহী পাপী যে এখনো পাপ করে চলেছে।

وَإِنْ تَنْتَقِمَ مِنِّي فَلَسْتُ بِأَيْسٍ - وَلَوْ أَدْخَلُوا نَفْسِي بِجُزْمِ جَهَنَّمَ.

আর যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেন, তবে আমি নিরাশ হবো না।

এমনকি যদিও তারা (ফেরেশতারা) আমার গুনাহের জন্য আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়।

فَصِيحًا إِذَا مَا كَانَ فِي ذِكْرِ رَبِّهِ - وَفِي مَا سِوَاهُ فِي الْوَرَى كَانَ أَعْجَمًا.

(একজন ন্যায়পরায়ণ বান্দার উদাহরণ হলো-) যখন সে তাঁর রবের কথা বলে, তখন সে তাঁর (প্রশংসায়) বাকপটু হয়ে পড়ে।

আর যখন অন্যদের প্রশংসা আসে তখন সে সেরূপ (বাকপটু) হয় না।

يَقُولُ حَبِيبِي أَنْتَ سُؤْلِي وَنُعَيْتِي - كَفَى بَكَ لِلرَّاجِينَ سُؤْلًا وَمُعْنَمًا.

সে বলে, “হে আমার প্রিয় রব! আমি শুধু আপনারই সমীপে প্রার্থনা করি এবং আপনারই সম্বল চাই।

নিজ মঙ্গল কামনা ও আকুল আকাঙ্ক্ষা করার জন্য আপনার সান্নিধ্য লাভের কামনা ও আকাঙ্ক্ষা করাই যথেষ্ট -যারা আশা করে তাদের জন্য।

أَلَسْتُ الَّذِي غَذَيْتَنِي هَدِيَّتِي - وَلَا زِلْتَ مَنَانًا عَلَيَّ وَمُنْعَمًا.

আপনি কি সেই সত্তা নন, যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন?

এবং আপনি আমার প্রতি সদয় হওয়া থেকে কখনো বিরত হন নি এবং সকল সুযোগ সুবিধাই আমাকে দিয়েছেন।

عَسَى مَنْ لَهُ الْإِحْسَانُ يَغْفِرُ زَلَّتِي - وَيَسْتَرْ أَوْزَارِي وَمَا قَدْ تَقَدَّمَا.

অসীম ক্ষমাশীলতায় আপনি আমার ভুলগুলো ক্ষমা করবেন।

এবং আমার কৃত অপরাধ ও অন্যান্য যা কিছু (গুনাহ) আমার দ্বারা হয়েছে সেগুলো ঢেকে রাখবেন -এই আশা নিয়েই রয়েছি।

সুতরাং আমাদেরও সেই একই কর্তব্য যে আমরা মহান আল্লাহর জাহান্নামের ভয় করবো এবং তার মাগফেরাত ও রাহমাত লাভের আশাও রাখবো। আর এজন্য আমাদেরকে প্রতিনিয়ত জাহান্নাম ও জান্নাত সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা করতে হবে। এ বিষয়টির চর্চা আমাদের সমাজে বাড়াতে হবে।

‘জান্নাত ও জাহান্নাম’ বইটি মূলত The Hereafter বা পরকাল সিরিজের তৃতীয় পর্ব। এই সিরীজে প্রথম পর্ব হচ্ছে ‘পরকালের পথে

যাত্রা’। দ্বিতীয় পর্ব- ‘দাজ্জাল, মহাপ্রলয় ও বিচার দিবস’। এই তিন পর্বে পুরো সিরিজটি সম্পন্ন।

শায়খ আওলাকী রহ. কে মহান আল্লাহ এক অসাধারণ যোগ্যতা ও বাগ্মীতা দান করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় খুব সাবলীলভাবে তিনি যে আলোচনাগুলো উপস্থাপন করেছিলেন তা বাংলা ট্রান্সক্রিপ্টে বই আকারে আনতে গিয়ে খুবই বেগ পেতে হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আমরা রেইন ড্রপস এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তাদের সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

মূল আলোচনায় শায়খ আওলাকী রহ. আরব শায়খদের মতো যেভাবে অনর্গল উদ্ধৃতি ও কুরআন হাদীসের রেফারেন্স দিয়েছেন তা সংগ্রহ ও বইয়ে সংযুক্ত করতে গিয়ে ব্যয় হয়েছে এক দীর্ঘ সময়। আয়াত ও হাদীস সংযুক্ত করা ও সম্পাদনার সময় আমরা আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি বইটিকে সর্বাঙ্গীনভাবে তাঁর আলোচনার মতো সুন্দর করে তোলার জন্য, কিন্তু কতোটুকু সফল হয়েছে তা নির্ণয়ের ভার সম্মানিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের উপরই রইলো।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সকলকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাতে যাওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

বিনীত

-মুহাম্মাদ ইসহাক খান

স্বত্বাধিকারী: খান প্রকাশনী

২৪/১০/২০১৪

Email: ishak.khan40@gmail.com

পরকালের আলোচনা

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

যদি আমাদের কখনো এমন মনে হয় যে আখিরাতের বিষয় নিয়ে এত কথা বলার কি আছে? তাহলে বুঝতে হবে, আমরা আসলে সঠিকভাবে ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না। আমরা আমাদের দাওয়ার কাজেও অনেক সময়ই উপস্থাপনায় কিছু ভুল করে ফেলি।

আপনারা আয়েশার রাযি. এই কথাটা সম্পর্কে চিন্তা করুন। সাইয়িদা আয়িশা রাযি. বলেন,

إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةُ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ. لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا. وَلَوْ نَزَلَ. لَا تَزْنُوا. لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزَّنا أَبَدًا.

অর্থ: “কুরআনে সবার আগে যে জিনিসটির কথা বলা হয়েছে তা হল জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না লোকদের হৃদয় আল্লাহর প্রতি, ইসলামের দিকে নত হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এসেছে ঈমানের কথা আখেরাতের কথা। তারপর এসেছে হালাল এবং হারামের হুকুমগুলো। (এমনটি না হয়ে) যদি কুরআনে এই আয়াতটা সর্বপ্রথম নাযিল হত, যে, “তোমরা মদ খেও না”, তাহলে লোকেরা বলত, “আমরা কখনও মদ খাওয়া ছাড়ব না।”

যদি সর্বপ্রথম এই আয়াত নাযিল হত যে তোমরা যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, তাহলে লোকেরা বলত, “আমরা কখনই যিনা-ব্যভিচার থেকে বিরত হব না”। (সহীহ বুখারী, ফাজায়েলে কুরআন অধ্যায়। হাদীস নং ৫০৪৪)

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ

عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

অর্থ: “প্রতিটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই হবে প্রকৃত সফল। আর দুনিয়ার জীবন তো শুধুই ধোঁকার সামগ্রী।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি. বলছেন যে, “যদি কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত হতো ‘তোমরা মদ পান করো না।’, তাহলে লোকেরা বলতো ‘আল্লাহর কসম, আমরা মদ পান করা বাদ দিবো না।’ যদি কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত হতো ‘তোমরা যিনা করো না।’, তাহলে লোকেরা বলতো ‘আল্লাহর কসম, আমরা যেনা করা বাদ দিব না।’

কিন্তু কুরআনের প্রথম আয়াত ছিল ‘সূরাতুল মুফাসসাল (মাক্কি জীবনের প্রথম দিকের নাজিল হওয়া সূরাসমূহ)’, সেখানে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা। এর ফলে লোকদের অন্তর আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে পড়ে, তারপরই হালাল-হারামের আয়াত নাযিল করা হয়।”

আয়েশা রাযি. বলছেন, যদি কুরআনের প্রথম আয়াতগুলো আমাদের করণীয়-বর্জনীয় নিয়ে আলোচনা করতো, যেমন-

এটা করা যাবে না!

ওটা করা যাবে না!

প্রথমেই বিধি নিষেধ!

তাহলে লোকেরা তাঁর অনুসরণ করতে সমস্যায় পড়ে যেতো। এটা তাদের জন্য কষ্টকর ও কঠিন হয়ে যেতো।

আপনি যদি প্রথম দিনই মানুষকে বলতে শুরু করেন যে এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, তাহলে মানুষ সেই আহবানে সাড়া দিবে না। আয়েশা রাযি. বলছেন যে, কুরআনের প্রথম আয়াতগুলো জান্নাত এবং জাহান্নাম নিয়ে কথা বলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁদের অন্তর আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে যায়, তারপর হালাল-হারামের বিধান নাযিল করা হয়।

আয়েশা রাযি. এর এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানুষের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি অনুগত করার জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলতে হবে। আখিরাতের স্মরণ মানুষের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি অনুগত করে দেয়। সংযুক্ত করে দেয় এবং দরকার বেশি বেশি আখিরাতের স্মরণ করা, মৃত্যুর স্মরণ করা। অথচ আমরা এই বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেই না।

পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন :

আসলে আমরা বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, আমরা দুনিয়ার প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছি এবং এই দুনিয়াকেই বাস্তব বলে মনে করছি। যেন আমাদের এখানেই থাকার কথা। যেন আমরা চিরদিন এখানেই থাকবো -যা আসলে সত্য নয়। আমরা আসলে একটা ঘোরের মধ্যে বাস করছি, যা খুব শীঘ্রই কেটে যাবে এবং আমরা বাস্তবতার সম্মুখীন হব। আর বাস্তবতা হচ্ছে মৃত্যুর পরের জীবন, পরকালের জীবনই হচ্ছে প্রকৃত জীবন।

আমরা আখিরাত সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কবাণী পাচ্ছি না এবং আমরা যদি এই সতর্কবাণীর চর্চা শুরু না করি, বার বার এই বিষয়টি স্মরণ না করি; তাহলে আমরা ধীরে ধীরে তা ভুলে যাব। উদাসীন গাফেল হয়ে পড়ব। আমরা মানুষেরা অনেকে অনেক কিছুর প্রতি আসক্ত। এই পৃথিবী, আমরা যাদেরকে ভালোবাসি তাদের প্রতি আমরা বেশি আসক্ত, আমাদের ভোগসামগ্রীর প্রতি আমরা বেশি আসক্ত। আমাদের বাড়ি, গাড়ি, আমরা এই পৃথিবীর বিলাসিতার প্রতি বেশি আসক্ত। কিন্তু আমরা আখিরাতের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ কানেক্টেড বা সংযুক্ত নই।

কাজেই আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত, এখন যদি মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের কাছে আসেন, ঠিক এই মুহূর্তেই যদি আমার ডাক চলে আসে এবং আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমরা এখন মরতে প্রস্তুত কি না? (যদিও তিনি আশ্বিাদের ছাড়া আর কারো অনুমতি নেন না) তবে কি হবে আমাদের উত্তর? আমরা কি প্রস্তুত? আমরা কি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত? আমরা কি এই মুহূর্তে আল্লাহর সাথে দেখা করতে চাই? না আমরা এখনও এই দুনিয়ার প্রতি আসক্ত? আমরা যদি সবসময় এই বিষয়টা নিয়ে না ভেবে শুধু এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকি, সেটা কি উচিত হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে প্রচুর কথা বলতেন, সবসময় তিনি এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতেন, তিনি আখিরাত নিয়ে এত বেশি কথা বলতেন, বিশেষ করে জাহান্নাম নিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশি বলতেন যে, একজন মহিলা সাহাবী সূরা কাহাফ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন শুধু রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জুমুআর খুতবা শুনে শুনে। আর আমরা জানি সূরা কাহাফে আখিরাত নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে জাহান্নাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো ঘন ঘন জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তার কারণ এই যে আল্লাহর পরে এই উম্মতের প্রতি সবচেয়ে বেশি যিনি দয়াপরবশ, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি চান নি যে তাঁর উম্মত কোন ক্ষতির সম্মুখীন হোক এবং তিনি সবসময় আমাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

— একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবা শুরু করেন এভাবে, আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলদের প্রতি সালাম প্রেরণের পরে তিনি বলেন,

أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ. أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ. أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ.

“আনয়ারতু কুমুননার! আনয়ারতু কুমুননার! আনয়ারতু কুমুননার!”

অর্থ: “আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি!

আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি!

আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি!”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কথা বার বার বলছিলেন এবং তাঁর গলার আওয়াজ বড় হচ্ছিল। একজন সাহাবা বলেন যে তখন রাসূলের কথার আওয়াজ এতো উচ্চ ছিলো যে কেউ যদি বাজারে থাকতো তাহলে সেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে পেত।

ঐ সাহাবা আরও বলেন, মসজিদে সাহাবীদের কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তাঁদের অন্তর এতটাই নরম ছিল। কিন্তু আমাদের অন্তর বড়ই কঠিন, আমরা এমন সময়েও হাসতে পারি যখন আসলে আমাদের কান্না

পাওয়ার কথা। বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখি লোকজন জানাযার জন্য সমবেত হয়েছে কিংবা লাশ দাফন করছে, সেখানেও একে অপরের সাথে হাসি তামাশা করছে।

অপরদিকে উসমান ইবনে আফফান রাযি. যখন কোন দাফনে অংশ নিতেন, তখন তিনি কবরের পাশে বসে এত বেশি কাঁদতেন যে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারতেন না। তিনি এতটাই আক্রান্ত হতেন যে নিজের পায়ের ওপর ভর করে উঠে দাঁড়াতে পারতেন না।

সাহাবারা তাঁর কাছে এসে বলতেন, ‘কি হয়েছে আপনার?’

তিনি বলতেন ‘আখিরাতের প্রথম ধাপ হচ্ছে কবর, এই ধাপটি যদি ভালো করে পার করে ফেলা যায়, পরবর্তী ধাপগুলো পার হওয়া সহজ হয়। আর এই ধাপটি যদি কঠিন হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপগুলোও কঠিন হবে।’

এই চিন্তা, এই ভাবনা এবং এই আখিরাতের স্মরণে অন্তরের ওপরে প্রভাব, সংবেদনশীলতা, এগুলো আমাদের বড় অভাব। আমার মনে হয়— অন্তরের এই সংবেদনশীলতার আমাদের বড় অভাব। আমরা আখিরাতের কথা শুনি কিন্তু আমাদের অন্তরে কোন প্রভাব পড়ে না!

আমাদের এই অনুভূতি ফিরিয়ে আনার উপায় হচ্ছে সবসময় সত্য জিনিসটাকে গভীরভাবে স্মরণ করা। আমরা আসলে স্বপ্নের জগতে বাস করি। আমাদের মনে হয় আমাদের চারপাশে যা রয়েছে, তা চিরদিন থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন! এর কিছুই একদিন থাকবে না।

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

অর্থ: “(জমিন ও) তার ওপর যা কিছু রয়েছে সে সবই (একদিন) ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী থাকবে শুধু একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা।” (সূরা আর রাহমান ৫৫, আয়াত ২৬-২৭)

সুবহানাল্লাহ!

কুরআন এবং সুন্নাহ আখিরাতের বিষয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করেছে যে আর কোন ধর্মে এত বেশি আলোচনা করা হয় নি। আমরা ইনশাআল্লাহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেমন, জাহান্নামের

আয়তন, জাহান্নামের গভীরতা, জাহান্নামের দরজাসমূহ, জাহান্নামের জ্বালানী, জাহান্নামের চিরস্থায়ীত্ব, জাহান্নামীদের খাদ্য, তাদের পোশাক, জাহান্নামের শাস্তি, জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর এবং আমরা আলোচনা করবো কোন কোন কাজ মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়।

আবারও বলছি, আখিরাতকে আমাদের যতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত ততটা আমরা দিচ্ছি না। আমরা যদি আধুনিক বিশ্ব এবং সাহাবা রাযি.দের জীবনী লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে তাঁরা কতটা সতর্ক ছিলেন এই ব্যাপারে। সর্বক্ষণ তাঁদের মনে আখিরাতের চিন্তা জাগ্রত থাকতো, তাঁরা সবসময় একে অপরকে আখিরাত সম্পর্কে সতর্ক করতেন।

আর কুরআন!

এটা খুবই কম হয় যে আপনি কুরআনের একটি পৃষ্ঠা পড়বেন কিন্তু সেখানে আখিরাতের উল্লেখ থাকবে না। কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এতো বার জান্নাত এবং জাহান্নামের কথা বললেন?

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এটা আমাদের জন্য খুব জরুরি।

একই কথা বার বার বলা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমাদেরকে বার বার সতর্ক করেছেন এ ব্যাপারে। এর কারণ হচ্ছে আমাদের অন্তর পরিবর্তনশীল, তা খুব সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

‘কালব’ শব্দটি হচ্ছে অন্তরের আরবী শব্দ। ‘কালব’ এসেছে ‘তাকাল্লুব’ থেকে যার মানে হচ্ছে ‘ফুটন্ত পানি’। একটি পাত্রে যেমন ফুটন্ত পানি বার বার ওঠা-নামা করে (এমন কিছু যা সদা পরিবর্তনশীল), আমাদের অন্তরও তেমন। আর এটার সুন্দর প্রমাণ হচ্ছে ছোট বাচ্চা, যে হাসতে থাকে আবার পর মুহূর্তেই কাঁদতে শুরু করে। আর তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দোয়ায় বলতেন,

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

ইয়া মু'কাল্লিবাল 'কুলুব, সাক্বিত 'কুলুবানা 'আলা দ্বীনিকা'।

অর্থ: “হে অন্তর পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অবিচলিত রাখো।”

কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে,

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

অর্থ: “হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন। হে আমাদের রব! আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮)

হযরত উম্মে সালাম রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দু'আটি বেশী বেশী পাঠ করতেন।” (সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ৩৫২২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব ঘন ঘন এই দোয়াটি পড়তেন, তাই আমাদের উচিত এই দোয়াটি সবসময় পড়া। আমাদের উচিত সবসময় আখিরাতের কথা স্মরণ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তাঁর আর আমাদের উদাহরণটা হচ্ছে এমন যে, একজন মানুষ (রাসূল) মরুভূমিতে রাতের অন্ধকারে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন... (যখনই কোন অন্ধকার জায়গায় আলো জ্বালানো হয়, তা পোকাদের আকর্ষণ করে, বাতি জ্বালালে যেমন পোকারা সেটাকে ঘিরে থাকে, তেমনি করেই তারা আগুনকে আলো ভেবে সেখানে ঝাঁপ দেয় এবং পুড়ে মারা যায়।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা সেই আগুনকে আলো ভেবে সেখানে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছে কিম্বা আমি (রাসূল) তোমাদেরকে ধরে রাখতে চাইছি, কিম্বা তারপরও কিছু লোক আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদেরকে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সবসময় সুরক্ষিত রাখতে চান, তিনি চান না আমাদের কোন ক্ষতি হোক। তারপরও কিছু

লোক নিজেদেরকে জাহান্নামে ছুঁড়ে দিচ্ছে, যদিও তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

৫ আর আমরা আখিরাত নিয়ে, পরকাল নিয়ে যত বেশি কথা বলব ততই আমাদের কাছে এই দুনিয়ার জীবন আর আখিরাতের জীবন পরিষ্কার হয়ে যাবে। জিবরাঈল আ. এর কাছে বিষয়টা খুব পরিষ্কার ছিল। জিবরাঈল আ. বিশ্বাস করতে পারেন না কিভাবে কিছু মানুষ জান্নাতের বিনিময়ে জাহান্নাম কিনে নেয়!!

জিবরাঈল আ. বলেন, “আমি বুঝতে পারি না কিভাবে একজন মানুষ ঘুমাতে পারে যখন সে জানে জাহান্নাম তার জন্য অপেক্ষা করছে!

আর আমি এও বুঝতে পারি না যে, একজন মানুষ কিভাবে ঘুমাতে পারে যখন সে জানে জান্নাত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে!”

আমরা কিভাবে ঘুমের স্বাদ আশ্বাদন করবো যখন আমাদের জন্য হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম অপেক্ষা করছে।

উমর ইবনে আব্দুল আজিজের রহ. এর স্ত্রী বর্ণনা করেন যে, এক রাতে উমর ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে শুরু করলেন এবং বাকি রাত ঘুমোতে পারলেন না। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, ‘আমার মনে পড়লো যে এমন একদিন আসবে যেদিন আমাকে হয় জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যেতে বলা হবে।’ এটা শুধু উমর ইবনে আব্দুল আজিজের জন্য সত্য নয়, এটা আমাদের সবার জন্যই সত্য।

আমাদের সবাইকেই বিচার দিবসে দাঁড়াতে হবে

আমরা মনে করি এটা অনেক দূরের ঘটনা অথবা কাল্পনিক জগৎ। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে শীঘ্রই আমাদেরকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আমরা জান্নাত আর জাহান্নাম নিজের চোখে দেখতে পাবো। আমাদের উচিত সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। এটা আমাদের ভবিষ্যত, আমরা আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলছি।

আমাদের আত্মা সৃষ্টি করা হয়েছে অনন্তকালের জন্য। আমাদের আত্মাকে ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য সৃষ্টি করা হয় নি, একটা সময় আমাদের আত্মার কোন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু একবার যেহেতু এর সৃষ্টি হয়েছে, এটা অনন্ত

কাল বেঁচে থাকবে। এমন কোন সময় আসবে না যখন আমাদের আত্মার অস্তিত্ব থাকবে না।

আর সেই অনন্ত জীবনের জন্য পরীক্ষা হচ্ছে এই দুনিয়া, তারপর হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অতীতে যারা এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরাই জীবনকে শুরু দিয়েছেন। তাঁরা সাফল্যের জন্য কষ্ট করেছেন, একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

অর্থ: “এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।” (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩, আয়াত ২৬)

আর সেটাই হলো প্রতিযোগিতার মাঠ, আমাদের বৈষয়িক বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়, আমাদের উচিত পরকালের সাফল্যের জন্য প্রতিযোগিতা করা।

পবিত্র কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা প্রথমেই জাহান্নামের বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

মানুষ হিসেবে আমাদের জন্য সবচেয়ে ফলপ্রসূ অনুপ্রেরণা হচ্ছে পুরস্কার অথবা শাস্তির আলোচনা। ভাল কাজের পুরস্কার আর মন্দ কাজের শাস্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে অল্প সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। পরীক্ষার প্রশ্ন আমরা জানি, উত্তরও জানি। আমাদের কাছে কুরআন-হাদীস আছে। আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে আর ফলাফল ঘোষণা হবে কিয়ামত দিবসে। আর এই ফলাফল চূড়ান্ত, এর কোন পরিবর্তন হবে না।

এবার জাহান্নাম প্রসঙ্গে আসি। আমরা জাহান্নাম নিয়ে যতই কথা বলি না কেন আমরা কখনই আসল চিত্রটা কল্পনা করতে পারবো না। এটা শুধু বিষয়টা একটু পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা এবং জান্নাতের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। কেন?

কারণ এই দুনিয়ায় এমন কিছু নেই, যার সাথে আমরা মিল দেখাতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

“জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ গুণ বেশি তীব্র।”

এটা বলা হয়েছে শুধু তীব্রতা বুঝানোর জন্য, কিন্তু বাস্তবতা অন্যরকম। এই দুনিয়ায় কোন শাস্তি কিংবা পুরস্কার নেই, এই দুনিয়াটা আসলে পুরস্কার অথবা শাস্তি হওয়ার যোগ্য নয়। এই দুনিয়াটা যদি পুরস্কার হিসেবে যথেষ্ট হতো, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের জন্য দুনিয়াকেই পুরস্কার বানিয়ে দিতেন। আবার এই দুনিয়াটা যদি শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট হতো, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাফিরদের জন্য দুনিয়াকেই শাস্তি বানিয়ে দিতেন।

এই দুনিয়াটা আসলেই পুরস্কার অথবা শাস্তি হওয়ার যোগ্য নয়। তাই মুমিন অথবা কাফির কেউই এই দুনিয়াতে পুরস্কার অথবা শাস্তি লাভ করবে না। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের দু'টো বৈশিষ্ট্য দরকার, দু'টো বৈশিষ্ট্যের সামাজিক্য থাকা দরকার। সেগুলো হচ্ছে ভয় এবং আশা। আশা রাখতে হবে যে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আর ভয় করতে হবে এটা জেনে যে আল্লাহর শাস্তি ভয়াবহ।

এই দু'টো পাখির ডানার মতো, দু'টোর মাঝে সামাজিক্য থাকতে হবে। একটা যদি আরেকটার চাইতে শক্তিশালী হয়ে যায়, তাহলে আর পাখি ঠিকমত উড়তে পারবে না। আপনি যদি আল্লাহর কাছ থেকে খুব বেশি শুধু আশাই করেন, তাহলে প্রত্যাশার পাল্লা ভারী হয়ে যাওয়ায় আপনি অলস হয়ে যাবেন।

তাহলে আপনি জান্নাতের জন্য কষ্ট করতে পারবেন না। আপনি ভাববেন যে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল তিনি আমাকে মাফ করবেনই, আপনি তখন যা মন চায় তাই করবেন। আবার আপনি যদি আল্লাহর ক্ষমার আশা না করে শুধু ভয় করেন, তাহলে আপনার মনে হবে আল্লাহ আপনাকে কখনই মাফ করবেন না, যার ফলে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। ভাল কাজ করা বাদ দিয়ে দিবেন। দু'টোই চরম অবস্থা, কখনই এই দুই চরমে যাওয়া আমাদের কাম্য নয়। আমাদের উচিত একটা ভারসাম্যের মধ্যে

জীবনযাপন করা। আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর কাছ থেকে ভাল আশা করার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে জীবনযাপন করতে হবে। এই ভারসাম্য নষ্ট হতে দেয়া যাবে না।

আমরা যদি তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈশ্বরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পড়লে মনে হবে যে ঈশ্বর খুব রাগি আর গম্ভীর। মানুষের উচিত তাঁকে বেশি বেশি ভয় তো করা। আবার যদি নিউ টেস্টামেন্ট পড়েন তাহলে দেখবেন, সেখানে এমন এক ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে যিনি খুব দয়ালু আর ক্ষমাশীল। দু'টোতেই ভারসাম্যের অভাব রয়েছে। ইসলামে আছে ভারসাম্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে তিনি, দয়ালু আবার এও বলেন যে তাঁর শাস্তি ভয়ানক।

খেয়াল করুন আল্লাহর দু'টো নাম হচ্ছে الرحمن 'দয়ালু' আর الغفور 'ক্ষমাশীল' আর তাঁর শাস্তিও প্রবল। কিন্তু শাস্তি-প্রদানকারী তাঁর নাম নয়, তাঁর নাম হচ্ছে দয়ালু।

পরকালের পথে যাত্রায় জাহান্নাম আমাদের ভয়ের কারণ আর জান্নাত আমাদের আশার আলো।

জাহান্নামের গভীরতা

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন কাফিরদের জন্য, মুনাফিকদের জন্য আর সেই সব বিশ্বাসীদের জন্য যারা অনেক পাপ কামিয়েছে। তাদের জন্যই জাহান্নামের সৃষ্টি। জাহান্নামের আয়তন সম্পর্কে যদিও আমরা সঠিক কোন মাপ জানি না কিন্তু এর বর্ণনা শুনে বুঝতে পারি যে তা অনেক বড় এবং জাহান্নাম সবসময় আরো চাইবে, এটা কখনও পূর্ণ হয় না। যখনই তার মধ্যে কিছু মানুষ রাখা হবে তখনই সে বলবে, 'আরও আছে কি? হাল মিন মাযিদ?'

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِحَٰجَتِهِمْ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾

অর্থ: “একদিন আমরা জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি পূর্ণ হয়েছে?, সে বলবে, আরও আছে কি?” (সূরা ক্বফ, আয়াত ৩০)

তো জাহান্নাম সবসময় বেশি বেশি চাইবে। তার ভেতর জায়গা রয়েছে যত খুশি তত মানুষ নেয়ার। সে তখনই থামবে যখন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা তাকে থামতে বাধ্য করবেন।

জাহান্নামের বিশালতার আরেকটা মাপকাঠি হচ্ছে তার গভীরতা। এ বিষয়ে সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস রয়েছে। এই হাদীসটি একটি অলৌকিক হাদীস, আমরা এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবো না। ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَذَرُونَ مَا هَذَا ؟

قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ

خَرِيفًا، فَلَا أَنْتَهَى إِلَى قَعْرِ النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ.)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ তাঁরা একটি

বিকট আওয়াজ শুনতে পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি জানো, এটা কিসের আওয়াজ?' সাহাবারা বললেন, 'আল্লাহ আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, '৭০ বছর আগে জাহান্নামের ওপর থেকে একটি পাথর ছাড়া হয়েছিল, তা এই মাত্র জাহান্নামের ভূমি স্পর্শ করলো।' (সহীহ মুসলিম)

এই আওয়াজটা তাঁরা কিভাবে শুনলেন তা একটা অলৌকিক ব্যাপার। আওয়াজটা পৃথিবীর সব মানুষ শুনেছিল নাকি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর সাহাবা রাযি. শুনেছেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু হাদীসটি থেকে আমরা জানতে পারি যে পাথরটির ৭০ বছর সময় লেগেছিল জাহান্নামের গভীরতা স্পর্শ করতে। এর থেকেই বোঝা যায় যে জাহান্নাম কতো গভীর!

ওয় আরেকটি বিষয় থেকে জাহান্নাম সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তা হচ্ছে জাহান্নামকে ধরে রাখা ফেরেশতাদের সংখ্যা। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : يُؤْتَى بِحَٰجَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا " وَهَذَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ.

অর্থ: “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সত্তর হাজার দড়ি দিয়ে বেঁধে আনা হবে। প্রতিটি দড়ি ধরে থাকবেন সত্তর হাজার ফেরেশতা।” (সহীহ মুসলিম। সুনানুত তিরমিযি, জাহান্নাম অধ্যায়।)

জাহান্নামের বিশালতা সম্পর্কে ৪র্থ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সহীহ মুসলিমের আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেটাতে বলা হয়েছে যে চন্দ্র এবং সূর্যকেও জাহান্নামে ছুঁড়ে দেয়া হবে। এই বর্ণনার দ্বারাও আমরা বুঝতে পারি যে

জাহান্নাম কতো বিশাল। কারণ চন্দ্র এবং সূর্যের বিশাল আয়তন সম্পর্কে আমরা জানি।

আপনারা ভাবতে পারেন কেন চন্দ্র আর সূর্যকে জাহান্নামে ফেলা হবে? এটা কি তাদের শাস্তি? শাস্তি হলে কি কারণ?

এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর যারই উপাসনা করা হয়েছে তাকেই জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে। চন্দ্র এবং সূর্যকেও আল্লাহর পাশাপাশি উপাসনা করা হয়েছে, তাই তাদেরকেও সেখানে ফেলে দেয়া হবে।

১. চন্দ্রের আয়তন 2.19×10^{10} , পৃথিবীর ৮৫ গুণের ১/৮৫।

২. সূর্য, পৃথিবীর ১৩ লক্ষ গুণ বড়।

জাহান্নামের স্তরভেদ

জাহান্নামের লেভেল বা স্তর আছে। জান্নাতের ওপরের স্তর নিচেরগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো। আর জাহান্নামের স্তর যত নিচে তা তত ভয়াবহ। অর্থাৎ জান্নাতের স্তর নিচের থেকে ওপরের দিকে বাড়ে। আর জাহান্নামের স্তরগুলো ওপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

অর্থ: “অবশ্যই মুনাফিকরা, ভগুরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।” (সূরা নিসা, আয়াত ১৪৫)

এর ওপরেও জাহান্নামের আরও স্তর আছে। যেমন আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তার চাচা আবু তালিব থাকবেন জাহান্নামের একটি অগভীর খাদে। তাকে আগুনের দু'টি জুতা পড়িয়ে দেয়া হবে -এই যা। অন্যান্যদের চারপাশ আগুন দিয়ে ঘেরাও করা থাকবে। আবু তালিবের পায়ে গিরা পর্যন্ত আগুন থাকবে আর তাতেই তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। এটাই জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তি। সুতরাং আমরা একবার কল্পনা করার চেষ্টা করি, বড় শাস্তিগুলো কেমন হতে পারে!

জাহান্নামের দরজা বা বলা যায় গেইট আছে। জাহান্নামের দরজার সংখ্যা মোট সাতটি। আর জান্নাতের দরজার সংখ্যা আটটি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾

অর্থ: “এর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য একটি নির্দিষ্ট দল রয়েছে।” (সূরা হিজর, আয়াত ৪৪)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَتْ أُنُوبُهُمْ ۖ أَلْقَوْا لَهَا ۖ خَزَنَتُهَا أَلَمَ ۖ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بِلَىٰ ۖ وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ۝﴾

অর্থ: “আর কাফিরদেরকে সেদিন দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসূল আসেনি, যাঁরা তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত পড়ে শুনাতেন এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন?’

তারা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিলো।’ (কিন্তু রাসূলদের কথা না শোনার কারণে) আসলে কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথাই বাস্তবায়িত হয়েছে।” (সূরা যুমার, আয়াত ৭১)

জাহান্নামের জ্বালানী হবে জাহান্নামের মানুষ আর পাথর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝﴾

অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। সেই জাহান্নাম, যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে দয়ামায়াহীন, কঠোর স্বভাবের ফিরিশতাগণ, যারা কখনো আল্লাহর আদেশ সামান্যতমও অমান্য করে না। আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন তাঁরা তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেন।” (সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কাছে এই জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। তিনি আমাদের এবং আমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। (আমীন)

জাহান্নামের আগুনের জ্বালানী এর মধ্যেই থাকবে। জাহান্নামের মানুষ আর জাহান্নামের আগুন একে অপরকে পোড়াতে থাকবে।

কেমন হবে জাহান্নামের উত্তাপ?

আমরা এ ব্যাপারে কী জানি?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ وَأَصْحَابُ الشَّامِلِ مَا أَصْحَابُ الشَّامِلِ ۖ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۖ وَظِلٌّ مِّنْ يَّخْمُومٍ ۖ لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۝﴾

অর্থ: “আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে অতি গরম বাতাস আর উত্তপ্ত পানিতে। কালো ধূয়ার ছায়ায়। যা ঠান্ডাও না, আরামদায়কও না।” (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৪১-৪৪)

তিনটি জিনিসের দ্বারা আমরা গরম থেকে ঠান্ডা হতে পারি বা আমরা তাপ থেকে বাঁচতে পারি। “বাতাস”, “পানি”, “ছায়া”। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই তিনটি জিনিসের বর্ণনা দিয়েছেন যা বিকল্প হিসেবে জাহান্নামীদের কাছে থাকবে ঠান্ডা হবার জন্য।

“ফী সামুমীও ওয়া হামীম”। “সামুম” মানে হচ্ছে অত্যন্ত গরম আর শুকনা বাতাস। আরবে একটা বাতাস উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়। যা থাকে খুবই শুষ্ক আর যখন তা আরব মরুভূমির ওপর প্রবাহিত হয় তা আরও গরম হয়ে যায়। একে “সামুম” বলা হয়। তাই জাহান্নামিদের কাছে ঠান্ডা হওয়ার জন্য বাতাস হিসেবে থাকবে এই “সামুম” বাতাস যা খুব শুকনা আর গরম।

“হামীম” মানে পানি- কিন্তু ফুটন্ত পানি। এই পানিই তারা পাবে।

“ওয়া যিল্লিম মিন ইয়াহুমুম”- ছায়া। তারা ছায়া খুঁজতে থাকবে। আর তারা পাবে ঘন কালো ধূয়ার ছায়া। তারা যখন এর ছায়ায় আসবে, তাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইবে। সুতরাং জাহান্নামীরা পানি আর ছায়া হিসেবে এগুলোই পাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ﴾

অর্থ: “তুমি কি জানো ‘সাকার’ কী? যা তাদেরকে অক্ষতও রাখবে না আবার রেহাইও দিবে না। বরং তা মানুষের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে দিবে।” (সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ২৭-২৯)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقَدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ، قَالُوا: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَإِنَّهَا فَضَّلَتْ بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا، كُلُّهُمْ مِثْلُ حَرِّهَا.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আদম সন্তান দুনিয়াতে যে আগুন ব্যবহার করে তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।

সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! এমনকি দুনিয়ার সাধারণ আগুনই তো যথেষ্ট হতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (দুনিয়ায় ব্যবহৃত আগুনের তাপ) এর সাথে আরো উনসত্তর গুণ বেশি তাপমাত্রা যুক্ত করে জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।” (সহীহ মুসলিম)

মানে যদি দুনিয়ার আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া হতো তবে তাই যথেষ্ট ছিলো! চিন্তা করে দেখুন দুনিয়ার সব থেকে বেশী তাপমাত্রা থেকেও জাহান্নামের আগুনের তেজ আরো সত্তর গুণ বেশী শক্তিশালী। আর এটাই জাহান্নামের উত্তাপ!

সুতরাং সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ যা জাহান্নামীদের জন্য আছে তা হলো, আল্লাহ কুরআনে বলেন যে, জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বলা হবে,

﴿فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾

অর্থ: “অতএব তোমরা আযাব উপভোগ করতে থাকো, (আজ) আমি তোমাদের ওপর শাস্তির মাত্রাই কেবল বৃদ্ধি করতে থাকবো।” (সূরা নাবা, আয়াত ৩০)

✱ জাহান্নামীরা গিয়ে আল্লাহর কাছে তাদের অবস্থার কথা জানাবে। আর তার উত্তরে তাদেরকে বলা হবে যে, প্রতিদিন তাদের শাস্তি হবে আগের দিনগুলো থেকে বেশী। অর্থাৎ এর সাথে অভ্যস্ত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কারণ, অবস্থা উন্নত হচ্ছে না। বরং তা দিন দিন খারাপের দিকে যাবে। এর সময়কাল অসীম। চিরকাল এমনটি হতে থাকবে। আমি মনে করি এই একটি আয়াতই আমাদের ভয় দেখানোর জন্য যথেষ্ট। যাতে আমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হবার ঝুঁকি না নিই। কারণ তা কমবে না। বরং বাড়তে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাহান্নাম দেখতে এবং শুনতে পায়। আর কুরআন থেকেও আমরা জানি যে, জাহান্নাম শ্বাস নেয়। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا﴾

অর্থ: “যখন দূর থেকে জাহান্নাম তাদেরকে দেখতে পাবে, তখন তারা জাহান্নামের গর্জন আর হুঙ্কার শুনতে পাবে।” (সূরা ফুরকান, আয়াত ১২)

অর্থাৎ জাহান্নাম রাগে ফুঁসতে থাকবে।

এটি তিরমিযিতে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ عَنُقُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَأُذُنَانِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ: بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَالْمُصَوِّرِينَ.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “শেষ বিচারের দিনে জাহান্নাম থেকে আগুনের একটি গর্দান বের হয়ে আসবে যার দুইটি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখতে পাবে। তার দুইটি কান থাকবে, যা দ্বারা সে শুনতে পাবে। আর থাকবে একটি জিহ্বা যা কথা বলবে। সে বলবে, আমি এমন প্রত্যেককে পাকড়াও করবো যারা ‘জাব্বার’ মানে একরোখা বা যালিম। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব বানিয়েছে আর যারা মূর্তি তৈরী করতো (উপাসনার জন্য মূর্তি বানাতো)।” (সুনানাতু তিরমিযী। মুসনাদে আহমাদ)

জাহান্নাম চিরকাল থাকবে। এমন কোন মুহূর্ত আসবে না যখন জাহান্নাম শেষ হয়ে যাবে। ইমাম ত্বাহবী রহ. তাঁর আকীদার বইতে বলেন,

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ.

অর্থ: “জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরদিনই থাকবে। এমন কোন সময় আসবে না যে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।” (আকীদাতুত তাহাবী)

আর ইবনে হাযম বলেন, “আর এটাই এই উম্মাহর আলেমদের ঐক্যমত।”

জাহান্নামীদের দৈহিক গঠন

জান্নাতে যারা থাকবে আর জাহান্নামে যারা থাকবে তাদের শরীরের আকৃতি আমাদের বর্তমানের আকৃতির মতো থাকবে না। সেখানে মানুষের আকৃতি ব্যাপক পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এক হাদীসে রাসূল ইরশাদ করেন,

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضره مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة هذا.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জাহান্নামীদের চামড়ার পুরুত্ব হবে ৪২ ‘জিরা’। আর তাদের তিল বা আঁচিল হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। আর তারা যখন

বসবে তখন যেই পরিমাণ জায়গা দখল করবে তা হবে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত দূরত্বের সমান।” (সুনানাতু তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৭৭)

এক ‘জিরা’ সমান প্রায় ১ মিটার বা তিন ফিট। মানে প্রায় এক গজ। অর্থাৎ তাদের চামড়া হবে প্রায় ১২৬ ফিট মোটা।

কেন বিশেষ করে চামড়ার কথা বলা হল?

কারণ চামড়ায় সব অনুভূতির স্নায়ুগুলো শেষ হয়। আর সেখানেই আসলে ব্যথা যন্ত্রণা অনুভব হয়। এ তো গেল তাদের চামড়ার পুরুত্ব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তাদের তিল বা আঁচিল হবে উহুদ পাহাড়ের সমান।”

আর যারা উহুদ পাহাড় দেখেছেন তারা জানেন তা বিশাল। “তারা যখন বসবে তখন যেই পরিমাণ জায়গা দখল করবে তা হবে মক্কা থেকে মদীনা ৪২৬ ক্রি পর্যন্ত দূরত্বের সমান।” তো, কী কারণে তাদের আকার বড় করে দেয়া হবে? কেন? যাতে শাস্তি গ্রহণের জায়গা বৃদ্ধি পায়। যত বড় আকার হবে ততো বেশী পরিমাণ জায়গা জাহান্নামের আগুনের সংস্পর্শে থাকবে। জান্নাতবাসীরা যদিও আকারে বৃদ্ধি পাবে কিন্তু তাদের মতো এত বড় হবে না।

জাহান্নামীদের খাবার

জাহান্নামের খাদ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾

অর্থ: “জাহান্নামীদের জন্য খাবার হিসেবে কাটাবিশিষ্ট গাছ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। এটি তাদের পুষ্টও করবে না, তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না।” (সূরা গাশিয়াহ, আয়াত ৬-৭)

এটি কেমন খাবার আমরা নিশ্চিত জানি না। আল্লাহ এটিকে বলেছেন “দরী” (Ad dhari)। এটি দেখতে কেমন? আল্লাহ আ’লাম। আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু আল্লাহ এও বলেছেন যে এটি মানুষের না ক্ষুধা দূর করবে, আর না তাদের কোন পুষ্টি দিবে।

জাহান্নামীদের প্রধান খাদ্য হবে এক রকম গাছের ফল যার নাম “আয যাক্কুম।” আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴾

অর্থ: “অবশ্যই (জাহান্নামে) যাক্কুম গাছ থাকবে। যা গুনাহগারদের খাদ্য।” (সূরা দুখান, আয়াত ৪৩-৪৪)

আর আল্লাহ কুরআনে যাক্কুম গাছ সম্পর্কে আরো বলেন,

﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴾

অর্থ: “গলিত তামার মত তা পেটের ভিতর ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত গরম পানির মতো।” (সূরা আদ দুখান, আয়াত ৪৫-৪৬)

তারা সেই ফল খাবে আর তা তাদের পেটে গলে যাওয়া উত্তপ্ত তামার মতো ফুটতে থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা কুরআনের অন্য জায়গায় যাক্কুম গাছ সম্পর্কে বলেন,

﴿ أَذَلَّكَ خَيْرٌ نُّزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئَوسُ الشَّيَاطِينِ. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴾

অর্থ: “এই মেহমানদারী ভালো, নাকি যাক্কুম বৃক্ষের? যালেমদের জন্য আমি তা বিপদ স্বরূপ বানিয়ে রেখেছি। তা হচ্ছে এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়েছে। এর ফলগুলি এমন (বিশী), মনে হবে তা যেন (একেকটা) শয়তানের মাথা। তারা এ থেকেই খাবে আর এ দিয়েই তাদের পেট ভরবে। অতঃপর তাদেরকে ফুটন্ত পানি (আর পুঁজ) মিলিয়ে তাদের দেয়া হবে। তারপর নিঃসন্দেহে তাদের গন্তব্য হবে ভয়ঙ্কর আগুনের দিকে।” (সূরা সাফফাত, আয়াত ৬২-৬৮)

“যাক্কুম” গাছের মূল উৎপন্ন হয়েছে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। যেখানে মুনাফিকরা থাকবে। আর আমরা জেনেছি জাহান্নামের যত নিচে যাওয়া হবে ততো বেশী তা ভয়াবহ হতে থাকবে। জাহান্নামীরা এই গাছের ফল খাবে। তারা যতো খাবে ততো বেশী তারা ক্ষুধা অনুভব করবে, ততো বেশী তারা পিপাসা অনুভব করবে। তারা যখন পিপাসা মেটাতে যাবে তখন তাদেরকে দেয়া হবে ফুটন্ত গরম পানির মিশ্রণ। আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ تُمْ إِنَّكُمْ أَنُّهَا الصَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴾

অর্থ: “অতঃপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিরা” (সূরা ওয়াকি‘য়া, আয়াত ৫১)

এখানে আল্লাহ বিশেষভাবে তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, যারা সত্যকে জেনেও মিত্যা বানাত। আল্লাহ পরে বলছেন,

﴿ لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَلِيمِ. هَذَا نَزْلُهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴾

অর্থ: “তোমরা ভক্ষণ করবে যাক্কুম গাছের অংশ। অতঃপর তা দিয়েই তোমরা পেট ভরবে। তার ওপর পান করবে (জাহান্নামের) ফুটন্ত পানি। তাও আবার রোগাক্রান্ত পিপাসারত উটের মতো। আর এই হবে তাদের বিচার দিনের আপ্যায়ন।” (সূরা ওয়াকি‘য়া, আয়াত ৫২-৫৬)

উটের এক রকম রোগ হয়। তখন তারা পানি পান করতেই থাকে, করতেই থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মারা যায়। এরা পিপাসা অনুভব করে। আর তাই অনবরত পানি পান করতেই থাকে। কিন্তু পিপাসা আর ফুরায় না। এজন্য যতক্ষণ তারা মারা না যায় তারা পানি পান করতেই থাকে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন যে, জাহান্নামীরা এই রকম রোগে আক্রান্ত উটের মতো পানি পান করতেই থাকবে। কিন্তু তারা স্বাভাবিক পানি পান করবে না। তারা পান করবে ফুটন্ত পানি। সেই সাথে তাদের পিপাসা বাড়তেই থাকবে। তাদের আরও কী পানীয় থাকবে সে ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾

অর্থ: “এ হচ্ছে (তাদের পরিণাম), অতএব তারা তা আস্বাদন করুক, (আস্বাদন করুক) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। এ ধরণের আরও (বীভৎস) শাস্তি।” (সূরা সোয়াদ, আয়াত ৫৭-৫৮)

এই আয়াতে “হামীম” এবং “গাসসাক” সম্পর্কে বলা হয়েছে। “হামীম” এর অনুবাদ করা হয় ফুটন্ত গরম পানি। আর “গাসসাক” এর অনুবাদ আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী করেছেন ঘন, কালো, পচা দুর্গন্ধযুক্ত, অত্যন্ত ঠাণ্ডা এক প্রকার তরল পদার্থ।

আর ইমাম কুরতুবী রহীমাল্লাহ বলেন “গাসসাক” হল পুঁজ। ইমাম কুরতুবী আরও বলেন যে, এই পুঁজ হল জাহান্নামীদের মাংস পোড়া রস। জাহান্নামীদের মাংস আর চর্বি পুড়ে যে রস বের হবে তা আর তাদের ঘাম জমা করা হবে। আর তাই তাদেরকে পান করার জন্য দেয়া হবে। এটাই হলো “গাসসাক”।

মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ

يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾

অর্থ: “হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছা ঈমান আনো আর যাদের ইচ্ছা কুফুরী করো। নিশ্চয়ই আমি জালিয়দের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নামের আগুন। যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে রাখবে। জাহান্নামীরা যখন পানীয় চাইবে, তাদেরকে গলিত সীসার মতো জল দেয়া হবে, যা তাদের মুখমন্ডল ঝলসিয়ে দিবে, এ এক নিকৃষ্ট পানীয়।” (সূরা কাহাফ, আয়াত ২৯)

জাহান্নামীদের বিভিন্ন প্রকার পানীয় সম্পর্কে আমরা কোরআন থেকে যা জানি সেগুলো মোট চার প্রকার।

১) হামীম যা হচ্ছে ফুটন্ত পানি।

২) গাসসাক ও গিসলীন এগুলো হচ্ছে শারীরিক বর্জ্য পদার্থ।

৩) সাদীদ সাদীদ হচ্ছে পুঁজ যা মানুষের ক্ষতস্থান থেকে বের হয়।

৪) আল মুহল মানে ফুটন্ত তেল।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ،
إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ
الْخَبَالِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟

قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ غُصَّارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

অর্থ: হযরত জাবির রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “সকল প্রকার নেশার দ্রব্য হারাম। যারা দুনিয়াতে নেশার দ্রব্য গ্রহণ করবে, জাহান্নামে তারা পান করবে ‘তীনাতুল খাবাল’। সাহাবারা ‘তীনাতুল খাবাল’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটি হল জাহান্নামীদের রক্ত আর পুঁজ।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৩৯)

জাহান্নামীদের সর্বশেষ পানীয় হচ্ছে- আল মুহল মানে ফুটন্ত তেল।

‘হামীম’ হল ফুটন্ত পানি আর ‘মুহল’ হলো ফুটন্ত তেল।

তিরমিযী’র একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم -في قوله ويسقى من ماء
صدید يتجرعه- قال يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه
ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره يقول الله
وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم .

অর্থ: হযরত আবু উমামা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জাহান্নামীরা যেই পানীয় পান করবে, তা যখন তাদের মুখের কাছে নিয়ে আসবে, তাদের মুখের মাংস গলে পড়তে থাকবে। তারপরেও তারা তা পান করবে। যখন তারা সেই পঁচা পানীয় পান করবে তখন তাদের ভেতরকার সকল নাঁড়ি-ভুরি গলে পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, **وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ** তারা এমন গরম পানী পান করবে যা তাদের সকল নারি-ভুরি ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে- সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৫।” (সুনানাতুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৮৩)

এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তারা তা পান করবে। এর থেকে বোঝা যায় যে কি পরিমাণ পিপাসা তারা জাহান্নামে অনুভব করবে। তারা এই ফুটন্ত পানি আর ফুটন্ত তেল পান করতে বাধ্য হবে।

জাহান্নামীদের পোশাক

জাহান্নামীদের পোশাক সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা কুরআনে বলেন,

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾

অর্থ: “অতঃপর এদের মধ্যে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে; শুধু তাই নয়, তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচণ্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে।” (সূরা হাজ্জ, আয়াত ১৯)

তার মানে দাঁড়ালো তাদের পোশাক হবে আগুনের তৈরী। কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের পোশাক হবে ‘গলিত তামা’। বিষয়টা ভেবে দেখুন উত্তপ্ত গলিত তামা সবসময় তাদের শরীরের সাথে কাপড় হিসেবে লেগে থাকবে। ইরশাদ হচ্ছে

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾

অর্থ: “আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। তাদের পোশাক হবে (গলিত তামা বা) আলকাতরার’ এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে।” (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪৯-৫০)

জাহান্নামে বাসকারীদের শাস্তি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হবে। কারও কম কারো বেশী। সর্বনিম্ন শাস্তি পাবে যে ব্যক্তি তার সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ لَأَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা জাহান্নামের সবচাইতে কম শাস্তির মধ্যে অবস্থান করা এক জাহান্নামীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘তোমার কাছে যদি গোটা দুনিয়ার সকল সম্পদ থাকে তবে তুমি কি তা নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে দিতে রাজি হবে?’ সে উত্তর দেবে, ‘হ্যাঁ।’

আল্লাহ তখন জবাব দিবেন, ‘আমি তো তোমার কাছে এর অনেক কম চেয়েছিলাম। কেবলমাত্র আমার সাথে তুমি কাউকে শরীক করবে না এই স্বীকারোক্তিরই বাস্তবায়ন চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এই স্বীকারোক্তি প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছো।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৮৯)

আখিরাতে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের কাছে এই পৃথিবীতে তো খুব বেশি কিছু চান না। আল্লাহ আমাদেরকে সারা দুনিয়া পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করতে বলেন নি, তিনি আমাদের কাছে সামান্য কিছু বিষয়

^১ হাছে এমন আলকাতরা, যাতে দ্রুত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

চেয়েছেন, কিন্তু আজকে সেগুলোই আমাদের কাছে অনেক বেশী আর কঠিন বলে মনে হয়, অথচ সুবহান্নাহ, সেদিন যখন মানুষ নিজের চোখে জাহান্নামের ভয়াবহতা দেখবে, সেদিন তার কাছে সারা দুনিয়া ভরা স্বর্ণও সামান্য মনে হবে এবং সে নির্দিধায় তা দিয়ে দিতে চাইবে।

কিন্তু আল্লাহ সুবহান্নাহ তা'আলা আমাদের কাছে এত কিছু চান নি, সামান্য কিছু বিষয়, আমাদের করণীয়-বর্জনীয়, এগুলো মেনে চলা। ব্যস এতোটুকুই। কিন্তু বহু মানুষ আজকে নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দিয়েছে, সারা দুনিয়া ভরা স্বর্ণের বিনিময়ে নয়, সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে। কত শত মানুষ সালাতের ব্যাপারে উদাসীন সামান্য কিছু টাকা উপার্জনের জন্য। সালাতের সময় চলে যাচ্ছে অথচ তারা টাকা উপার্জনের পিছনে ছুটছে, এমনকি ইসলামের বিষয়ে চিন্তা ভাবনাও নেই তাদের অন্তরে, শুধু দুনিয়ার কারণে।

সত্যি বলতে কি আমরা সারাজীবন খেটেখুটে যা উপার্জন করি সেই সম্পদ কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিটির সম্পদও আখিরাতে কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ সেদিন বলবেন, আমি তো শুধু চেয়েছিলাম তোমরা আমাকে ইলাহ বলে মেনে নাও। তোমরা তা নাও নি।

এই ব্যক্তিটির শাস্তি কি হবে এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর বর্ণনা,

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ. إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ تَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ.

অর্থ: হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নামে যে ব্যক্তি সবচেয়ে ছোট শাস্তি পাবে তার পায়ের তলায় জ্বলন্ত কয়লা রাখা হবে, যার ফলে তার মগজ ফুটতে থাকবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৮৭)

এটাই হলো জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি। এছাড়া সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي صَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ يَبْلُغُ كَغَبِيهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعُهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ)

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কিছু সাহাবীর সাথে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর চাচা (আবু তালিব) এর কথা উঠলো। তখন তিনি বললেন, “হয়তো আমার আবেদনের কারণে তাকে আগুনের একটা অগভীর চৌবাচ্চায় রাখা হবে যার আগুন শুধু তাঁর পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করবে, যার ফলে তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৯৯। সহীহ মুসলিম)

আর জাহান্নামীদের সর্বোচ্চ শাস্তি কি হবে এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান্নাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾

অর্থ: “অবশ্যই মুনাফিকরা, ভগুরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।” (সূরা নিসা, আয়াত ১৪৫)

আমরা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জাহান্নামের বিভিন্ন শাস্তিগুলোর কথা জানতে পারি। আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾

অর্থ: “যারা আমার আয়াত ও সতর্কতাসমূহ অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করবো। যখনই তাদের চামড়া ঝলসে যাবে, এর পরিবর্তে পুনরায় নতুনভাবে চামড়া তৈরি হয়ে যাবে, যেন তারা তাদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে পারে।” (সূরা নিসা, আয়াত ৫৬)

এই আয়াতে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি যে, মাংসপেশি বা চর্বিস্তরের তুলনায় ত্বকে স্নায়ুকোষের সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। একারণেই চামড়া হচ্ছে ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অঙ্গ। এজন্য একটা সুই চামড়া ভেদ করলে যে ব্যথা অনুভূত হয়, মাংসপেশি ভেদ করার সময় ততোটা ব্যথা হয় না। একারণে জাহান্নামীদের শাস্তির সময় যখনই তাদের চামড়া বলসে যাবে, স্নায়ুকোষগুলো পুড়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা সাথে সাথে নতুন চামড়া দান করবেন।

আরেকটি শাস্তি হচ্ছে গলিত হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾

অর্থ: “অতঃপর এদের মধ্যে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে রাখা হয়েছে; শুধু তাই নয়, তাদের মাথার ওপর সেদিন প্রচণ্ড গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। এর সাথে তাদের চামড়াসহ শরীরে যা কিছু আছে তা গলে মিশে যাবে।” (সূরা হাজ্জ, আয়াত ১৯)

এরপর আছে মুখমণ্ডলের শাস্তি। মুখমণ্ডল মানবদেহের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখমণ্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾

অর্থ: “আগুনে তাদের (জাহান্নামীদের) মুখমণ্ডল পুড়ে বলসে যাবে, চোঁট বিকৃত হয়ে যাবে এবং দাঁতগুলি বেরিয়ে আসবে।” (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১০৪)

এগুলো ছাড়া অন্য একরকম শাস্তির উল্লেখ আছে, তা হল ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

অর্থ: “সেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের ছোঁয়া আশ্বাদন করো। নিশ্চয়ই আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।” (সূরা ক্বামার, আয়াত ৪৮-৪৯)

এই শাস্তিগুলো আল্লাহ তা'আলা যার যা কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রদান করবেন। তিনি সুবিবেচক ও ন্যায়বিচারক।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: “আর যারা গুনাহ ও মন্দ উপার্জন করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ (যারা শয়তানকে অনুসরণ করেছে, তাদের শয়তানের মতোই প্রতিফল দেওয়া হবে) লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের মুখে ছেয়ে যাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য তাদের কারো জন্য থাকবে না। তাদের মুখমণ্ডলগুলো এমন হবে যেন তা রাতের গভীরতম অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন। তারাই হল আগুনের অধিবাসী, তারা সেখানে অনন্তকাল ধরে বাস করবে।” (সূরা ইউনুস, আয়াত ২৭)

চিন্তা করে দেখুন, অনন্তকাল তারা এরকম শাস্তি পেতে থাকবে। কোনো এক দু'দিন এর জন্য নয়। কোন অল্প সময় না, লক্ষ কোটি বছর ধরে সামনে, পিছনে, ওপর-নিচ সব দিক দিয়ে প্রচণ্ড শাস্তি পেতে থাকবে। কতটা ভয়াবহ হতে পারে!

আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

অর্থ: “আর জাহান্নামের আগুন কাফিরদেরদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে।” (সূরা তাওবা, আয়াত ৪৮)

তারা যেদিক যাবে, আগুন তাদের ওপর ছেয়ে যাবে। আর তারপর তাদের চামড়া পুড়বে, ঝলসে যাবে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে না। এই শাস্তির কারণ তাদের নিজেদেরই কৃতকর্ম।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: “যারা পাপ ও গুনাহ কামাই করে এবং নিজেদের পাপকাজের দ্বারা আবৃত করে রাখে, তারাই আগুনের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে।” (সূরা বাকার, আয়াত ৮১)

তারা নিজেদের পাপকর্ম দ্বারা ঘিরে রেখেছিল, আল্লাহ তাদের আগুন দ্বারা ঘিরে রাখবে। যেমন কর্ম, তেমন তার ফল। আল্লাহ বলেন, -এবং আগুন তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করবে” - আল্লাহই ভালো জানেন এর দ্বারা শারীরিক না মানসিক কষ্টের কথা বোঝানো হচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿كَأَلَّا لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ.

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ﴾

অর্থ: “কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই নিষ্ক্ষেপ করা হবে হুতামা’য়। আর তুমি কি জানো হুতামা কি? এটা আল্লাহর সৃষ্ট আগুন। যা হুৎপিও পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে। প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে।” (সূরা হুমায়, আয়াত ৪-৮)

এরপর আছে বৃহদাস্ত্র দ্বারা টানা, এ শাস্তিটা দেওয়া হবে তাদের যারা অন্যকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দকাজ থেকে দূরে থাকতে বলে, কিন্তু নিজেই তা করে না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ، فَيُطَخَّنُ فِيهَا كَطَخْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟

فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ.

অর্থ: “উসামা রাযি. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, একজন মানুষকে জাহান্নামের আগুনে নিষ্ক্ষেপ করা হবে এবং তাকে বৃত্তাকার পথে ঘুরানো হবে ঠিক একটি আটার কলের গাধার মতো তার বৃহদাস্ত্রকে মাঝে রেখে এবং লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করবে। এতে জাহান্নামের অধিবাসীরা বলবে, তুমি কী অপরাধে এখানে এসেছ? কী করেছে। তারপর তারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি সেই ব্যক্তিটি না যে আমাদের সৎকাজ করতে বলতো আর মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলতো?

তখন সে জবাব দিবে, হ্যাঁ, আমি সৎকাজ করতে বলতাম কিন্তু নিজে কখনো সেটা করতাম না এবং অন্যকে মন্দকাজ থেকে দূরে থাকতে বলতাম কিন্তু নিজে সবসময় মন্দকাজে ডুবে থাকতাম।” (সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১২৬৭)

পুরাতন আমলে এক রকম কল ছিল যাতে একটির ওপর একটি বড় পাথরের মাঝে গম রাখা হত। গাধা দিয়ে ওপরের পাথরটা বৃত্তাকারে ঘুরানো হতো আর তাতে করে আটা তৈরি হতো।

যে লোক অন্যকে সৎপথে ডাকবে, পাপকাজ থেকে দূরে থাকতে বলবে অথচ নিজেই তা করবে না, তাকে তার শাস্তিস্বরূপ এরকম আটার কলকে নিজ অস্ত্র দ্বারা টানতে হবে। এটাই তার দ্বিমুখীতার পরিণাম। যা প্রচার করা তা নিজে না মেনে চলার ফল। শুধু তাই না, তাদের শেকল দিয়ে টানা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ. فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾

অর্থ: “যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে— ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে।” (সূরা মু’মিন, আয়াত ৭১-৭২)

এছাড়াও আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

অর্থ: “আর জাহান্নামীদের জন্য জাহান্নামে থাকবে লোহার হাতুড়ী। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফিরিয়ে আনা হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আশ্বাদন করো।” (সূরা হজ্জ, আয়াত ২১-২২)

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

অর্থ: “(দুনিয়ায় সুখে-শান্তিতে থাকার পর শেষ বিচারের দিনে তার কষ্ট-অনুতাপগুলি ফুটে উঠবে।) যখনই তারা তাদের শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, তখনই তাদের আক্ষেপ প্রকাশ পাবে। তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথেই বিচার করা হবে, তাদের ওপর কোনো সামান্যও জুলুম করা হবে না।” (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৪)

কারণ তাদের কথা শোনার মতো তখন কেউ থাকবে না। তারা আল্লাহর নবীদের দ্বীনের দাওয়াতকে অবজ্ঞা করেছিল, আল্লাহ সেই দিন তাদের অবজ্ঞা করবেন। আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾

অর্থ: “জাহান্নামীদেরকে সেদিন বলা হবে, আজ আমরা তোমাদের ভুলে গেলাম, উপেক্ষা করলাম, যেমনভাবে তোমরা এই দিনকে উপেক্ষা করেছিলে। আর তোমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য ও আশ্রয়স্থল হলো জাহান্নামের আগুন এবং তোমাদের কোনো সহায়তাকারী নেই।” (সূরা জাসিয়া, আয়াত ৩৪)

তারা যেহেতু তাদের কাছে প্রেরিত দ্বীনকে অস্বীকার করেছিল, আল্লাহও তেমন তাদের অনুনয়-অনুতাপকে অস্বীকার করবেন, যার ফলে জাহান্নামীদের অন্তর প্রচণ্ড আক্ষেপবোধে জর্জরিত হবে।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾

অর্থ: “আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজদের ধ্বংস কামনা করবে। (কিন্তু তারা তাঁদেরকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য যতই অনুনয় করুক না কেন, তাদের কথা শোনা হবে না, বরং তাদেরকে বিদ্রূপ করে বলা হবে) ‘শুধু একবার নয়, বরং অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো।’” (সূরা ফুরকান, আয়াত ১৩-১৪)

তারা আল্লাহ তা’আলাকে তাদের ধ্বংস করে দিতে বলবে, এজন্য বারবার অনুরোধ করবে, কিন্তু আল্লাহ তাদের কথা শুনবেন না, যতই তারা এজন্য হা-হতাশ করুক না কেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾

অর্থ: “তারা সেখানে উচ্চস্বরে চিৎকার করবে এই বলে যে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের এখান থেকে বের করে দিন। আমরা সংকল্পে করবো, অতীতে যেমন করেছিলাম তেমন আর করবো না।” (সূরা ফাতির, আয়াত ৩৭)

কিন্তু আল্লাহ বলবেন,

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ﴾

অর্থ: “আল্লাহ বলবেন, ওখানেই থাকো, এখান থেকে (তোমরা) বের হতে পারবে না।” (সূরা যুখরুফ, আয়াত ৭১)

আরেক আয়াতে উল্লেখ আছে,

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾

অর্থ: “তারা (জাহান্নামীরা) বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। হে আমাদের রব! আমাদের এখান থেকে মুক্তি দিন। (একবার আবার নতুন করে সুযোগ পেয়েও) আমরা যদি অসৎপথে ফিরে যাই, নিশ্চয়ই আমরা ভ্রান্তি তে পতিত হবো।” (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১০৬-১০৭)

তারা আল্লাহর সাথে যাদের শরীক করতো তাদের কি পরিণতি হবে এই সম্পর্কে আরেক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ. لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমরা (মুশরিকগণ) ও তোমাদের মিথ্যা দেবতারা - যাদের আরাধনা করতে, তারা জাহান্নামের জ্বালানী ছাড়া আর কিছুই না এবং এতেই তোমাদের শেষ পরিণতি ঘটবে। যদি তারা সত্যিকার ইলাহ হতো তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। আর তারা সবাই তাতে স্থায়ীভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।” (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত ৯৮-৯৯)

শেষ বিচারের দিনে যারা মূর্তিপূজা করতো তাদের বলা হবে তাদের আরাধ্য মূর্তিগুলোর কাছে সাহায্য চাইতে। এটাই আল্লাহর ন্যায়বিচার। সে যে মূর্তির পূজা করতো, তাকে সেই মূর্তির কাছে এর পুরস্কার চাইতে বলা হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে নি, তাকে আল্লাহ কোনরকম সাহায্যও করবেন না।

আল্লাহ তাদের বলবেন তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে অনুসরণ করতে। অতঃপর সেই মূর্তিগুলোকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা (মুশরিকগণ) মূর্তিগুলোকে অনুসরণ করে আগুনে পতিত হবে। সূর্যকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্য-উপাসকরাও সেখানে পতিত হবে। এখন যদি প্রশ্ন আসে যে যীশুখ্রিষ্টের, অর্থাৎ ঈসা আ. এর অনুসারীদের কি পরিণতি হবে, তাহলে এটা বলা দরকার যে ঈসা আ. কখনো চান নি তাকে উপাসনা করা হোক। একজন সম্মানিত রাসূল হিসেবে ঈসা আ. এর স্থান হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে।

এজন্য ত্রুশকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাঁর অনুসারীদের বলা হবে, হে ত্রুশের অনুসারীগণ, ত্রুশকে অনুসরণ করো। অতঃপর তারা সেটাকে অনুসরণ করে জাহান্নামে পতিত হবে।

একই পরিণতি আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল দেবতা বা উপাস্যের ক্ষেত্রেও ঘটবে। আমি যদি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে থাকি, আমাকে তাঁর কাছেই এর প্রতিদান নিতে হবে। একারণেই আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরীক করা অর্থাৎ শিরক করা সবচেয়ে বড় এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ মুশরিকদের বলবেন, তুমি আমার উপাসনা করো নি, তাই যার উপাসনা করেছিলে, তার কাছে এর প্রতিদান চেয়ে নাও।

চিরকাল জাহান্নামে থাকার কারণসমূহ

যারা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে, তারা হবে দু'ধরণের। দু'শ্রেণীর মানুষ চিরকাল জাহান্নামের আযাবপ্ৰাপ্ত হবে। এ দু'শ্রেণী হলো মুনাফিক আর কাফের। এই আযাব সাময়িক সময়ের জন্য কিংবা ক্ষণস্থায়ী নয়, এক মিলিয়ন বা বিলিয়ন বছরেরও নয়; বরং এ দু' শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামে চিরকালের জন্য থাকবে। তারা এমন আযাব ভোগ করবে যে আযাবের শুরু আছে, তবে শেষ নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: “আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (সূরা বাকারাহ, ২: আয়াত ৩৯)

একটা প্রশ্ন আসতে পারে, কিভাবে একজন ৬০/৭০ বছরের পাপের জন্য চিরকালের জন্য আযাব ভোগ করবে!

কেন তারা দুনিয়াতে যতটুকু সময় অতিবাহিত করেছে ঠিক ততটুকু সময়ের জন্যই কেবল শাস্তি পাবে না?

মৃত্যু বলে কয়ে আসে না, হঠাৎ করে আসে। তাই চিন্তা করুন যে লোকটি ৬০ বছর ধরে বেঁচে আছে সে এখনো কুফরী করছে ৬১ বছর পরেও কুফরী করে চলেছে। সে ৬৫ বছর পরেও কুফরী করে চলেছে, ব্যাপারটা এরকম যে সে যদি চিরকাল বেঁচে থাকে সে কুফরের ওপরেই থাকবে। কারণ সে নিয়্যতই করেছে চিরকাল কুফরি করার, তাই সে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং নিয়্যত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এবার মুনাফিকদের ব্যাপারে আসা যাক। যারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করবে তারা হল মুনাফিক। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾

অর্থ: “অবশ্যই মুনাফিকরা, ভগুরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর আপনি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না।” (সূরা নিসা, আয়াত ১৪৫)

আর সর্বনিম্ন স্তর হল নিকৃষ্টতম। মুনাফিকদের অবস্থা কাফেরদের চেয়েও ভয়াবহ হবে। কারণ মুনাফিকরা কয়েকটি কঠিন অপরাধ করেছে। তারা তাদের কুফরীর পাশাপাশি প্রতারণা আর মিথ্যার মতো খারাপ অভ্যাসগুলোর আশ্রয় নিয়েছে।

মুনাফিকদের আরেকটি মারাত্মক অপরাধ -যে কারণে তাদের শাস্তিও বেশি হবে তা হচ্ছে তারা সত্যের খুব নিকটে থাকে, তারা সত্যকে ভালোভাবে জানেও। কিন্তু তারা ঈমান আনার ভান ধরলেও আসলে সত্যকে অস্বীকার (কুফরী) করে। তাই মুনাফিকদের অবস্থা কাফেরদের চেয়ে ভয়াবহ হবে।

কুফরারদের চেয়েও মুনাফিকরা মুসলিম উম্মাহর বেশী ক্ষতি সাধন করেছে। কারণ কুফরাররা প্রকাশ্যে খোলামেলা মুসলিমদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। আর এই মুনাফিকরা উম্মাহর বিরুদ্ধে গোপন ও প্রতারণামূলক চক্রান্তের নকশা আঁকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে মুনাফিকদের ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আমরা প্রথম যুগের মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ বড় ফিতনাসমূহের দিকে তাকালে, ইসলামের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে এসবের পেছনে মুনাফিকদেরই হাত ছিল। এমনকি এই মুনাফিকরা মদীনাতেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন করেছিল, অথচ তারা মুসলিমদের সাথে একসাথে মদীনাতেই বসবাস করতো।

সত্য জানা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করা, মুসলিমদের সাথে থাকা সত্ত্বেও তাদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা, মনের মাঝে কুফুরি থাকা সত্ত্বেও তা প্রকাশ না করে বরং তার ওপর ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ইত্যাদির কারণে মুনাফিকদের শাস্তি কাফিরদের থেকেও বেশি ও কঠিন হবে। তাদের শাস্তি হবে ভয়ংকর, চিরস্থায়ী।

যারা সাময়িক সময় জাহান্নামের থাকবে

এরা হলো সেই লোকেরা যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও এত পাপকর্ম করে যে দুনিয়ার ভোগান্তি, কবরের আযাব কিংবা হাশরের দিনের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁদের গুনাহসমূহ মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট না। তাই তাদের কিছু সময় জাহান্নামে কাটাতে হবে। অনেক ধরনের পাপকর্মের জন্য এই নিয়তি বরণ করতে হবে। যেসব কারণের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহতে সুনির্দিষ্টভাবে জাহান্নামের সতর্কীকরণ করা হয়েছে নিম্নে এমন কিছু কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. ভ্রান্ত আকীদার ফেরকাসমূহ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ فِينَا فَقَالَ « أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মতের লোকেরা অচিরেই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের ৭২ দল হবে জাহান্নামী আর একটি দল হবে জান্নাতী।” (আবু দাউদ হাদীস নং ৪৫৯৯। দারেমী হাদীস নং ২৫১৮। জামেউল আহাদীস হাদীস নং ৪৫৮২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই উম্মাহ পূর্ববর্তী উম্মাহগুলোর থেকে বেশী ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এখানে বিভিন্ন ফিকহের মাযহাবের ব্যাপারে কিংবা বিভিন্ন ইসলামিক দল কিংবা সংগঠন যারা একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের কথা বলা হচ্ছে না।

এখানে সেসব ফেরকার কথা বলা হচ্ছে যাদের ইসলামের মূল আকীদা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। যারা ইসলামের সুনির্দিষ্ট মূলনীতি ব্যতিরেকে নিজেদের জন্য নতুন বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ফেরকা আছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরেও নবুয়্যতে বিশ্বাসী। কিন্তু এটা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা আকীদার বিষয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর আর কোন নবী আসবেন না। যেমনটা কাদিয়ানীরা নতুন নবীর ওপর ঈমান আনে। তাই তারা এই ফেরকার মধ্যে গণ্য হবে এবং তারা জাহান্নামী। এরকম আরেকটি ফেরকা হল বাহায়িয়্যাহ। এমনকি কয়েক বছর আগে তারা নিজেদেরকে আলাদা ধর্মের ঘোষণা দিয়েছে। তারা আর কোনভাবেই ইসলামের সাথে নেই।

আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এই হাদীসটির অর্থ এই না যে, উম্মাহর বেশীর ভাগই জাহান্নামী। ৭৩ টির মধ্যে ৭২ টি জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে উম্মাহর বেশীর ভাগই জাহান্নামে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। কারণ উম্মাহর বেশীর ভাগ লোক বিশেষজ্ঞ নয়, এরা সাধারণ লোকজন। এরা মূলত বিশেষ কোন ফেরকার অনুসরণ করে না। এরা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করে। তারা কোন বিশেষ পরিচয় বহন করলেও কোন নির্দিষ্ট ফেরকার অংশ হিসেবে গণ্য হবে না। তারা সালাহ আদায় করে, যাকাত দেয়, তারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং ইসলামের মূল নীতিমালা সমূহও মান্য করে। এমনকি তারা ওইসব ফেরকা সংশ্লিষ্ট ভ্রান্ত আকীদাও পোষণ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে আরেকটি বিষয় জানা দরকার আর তা হলো, হাদীসটি বলছে না, এই ৭২ ফেরকা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। হয়ত কিছু ফেরকা চিরকাল থাকতে পারে আর কিছু চিরকাল নাও থাকতে পারে।

২. অযোগ্য ও দুর্নীতিপ্রায়ণ বিচারক :

তিরমিযী শরিফের একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তিন শ্রেণীর বিচারক আছে। যাদের মধ্যে

দু'শ্রেণীর বিচারকই জাহান্নামে যাবে আর বাকী এক শ্রেণী জান্নাতে যাবে। এই দুই শ্রেণীর এক শ্রেণী হল ঐসব বিচারকগণ যারা সত্য জানা সত্ত্বেও পার্থিব লোভ-লালসার উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে বিচার-ফয়সালা করে। আর অন্য শ্রেণীর বিচারকগণ হল যারা অজ্ঞ, বিচার করার কোন জ্ঞান কিংবা যোগ্যতাই নেই। এ দু'শ্রেণীর বিচারকগণ জাহান্নামে যাবে আর বাকী এক শ্রেণীর বিচারকগণ যাদের জ্ঞান আছে যারা সত্য জানেন এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করেন, তাঁরা জান্নাতে যাবে।

৩. মিথ্যা (জাল) হাদীস রচনাকারী :

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থ: “হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমার নামে মিথ্যা কিছু আরোপ করবে সে জাহান্নামের আগুনে তাঁর আসন বানিয়ে নেবে।” (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী)

এখানে জাল হাদীস রচনা করার কথা বলা হচ্ছে এমনকি যদিও তা ভালো অর্থ বহন করে। আর জাল হাদীস প্রচার করা সমপর্যায়ের পাপ না হলেও এটা একটা গুনাহের কাজ। তাই আমাদের হাদীস বলার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

৪. অহংকারী (কিবর) :

অহংকার শব্দটি হাদীসে *কিবর* হিসেবে এসেছে। এটা খুবই মারাত্মক একটি পাপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অহংকার (কিবর) থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।” (সহীহ মুসলিম)

এখানে অহংকারে পরিপূর্ণ অন্তরের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে খুব অল্প পরিমাণ অহংকারের পরিণাম সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একথা শুনার পর এক সাহাবী আরজ বকুলেন,

قال رجل: إن الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة. قال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، وغمط الناس."

অর্থ: “লোকে তো চায় তাঁর কাপড় ভালো হোক, জুতা ভালো হোক।” (অর্থাৎ সাহাবী রাযি. জিজ্ঞেস করছেন এটা অহংকার কি না?)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন “আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।

(অর্থাৎ আপনি যদি ভালো জামা-কাপড় পরিধান করেন এতে কোন সমস্যা নেই, এটা অহংকার নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন) এই কিবর বা অহংকার কি তা বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন “কিবর (অহংকার) হল সত্য (হক) প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।” (সহীহ মুসলিম)

এখানে সত্য প্রত্যাখ্যান করা বলতে কি বুঝানো হচ্ছে?

এর অর্থ হচ্ছে আপনার সামনে সত্য আসার পরেও নিজের আত্মদম্ভ ও অহমিকার কারণে তা প্রত্যাখ্যান করা। কারণ আপনি আপনার অজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান না। কারণ আপনার নিজের ওপর এতই আত্মবিশ্বাস

যে সত্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য কারো আদর্শ কিংবা মতামত আপনি গ্রহণ করতে পারছেন না। এটাই হল কিবর, অহংকার এবং একই সাথে এটা অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

৫. হত্যাকারী :

শরীয়াহর গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা অনেক বড় পাপের কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ জন্য জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: “যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে (বিশ্বাসী) ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তাঁর শাস্তি জাহান্নাম। যাতে সে স্থায়ীভাবে থাকবে, তার ওপর আল্লাহ ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।” (সূরা নিসা, আয়াত ৯৩)

কি ভয়াবহ শাস্তি দেখুন! জাহান্নাম, আল্লাহর অভিসম্পাত এবং মহাশাস্তি! এখানে কোন বিশ্বাসী কিংবা মুমিনকে হত্যার শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। এখন, কাকেরদের অন্যায়ভাবে হত্যার ব্যাপারে কি হবে? মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে যদি শাস্তি চুক্তি বিদ্যমান থাকে তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি শাস্তি চুক্তি করার পর কাউকে হত্যা করে বা কোনো যিম্মীকে হত্যা করে সে জান্নাতের দ্রাণও পাবে না।

অথচ জান্নাতের দ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও পাওয়া যাবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯৯৫। সুনানু ইবনে মাযা)

৬. রিবা-সুদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তি :

রিবা হল সুদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, যে সুদের কারবার করে তার শাস্তি জাহান্নাম। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সাতটি বড় গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন তাঁর মধ্যে এই রিবা বা সুদ একটি। তাই সুদকে কখনো ছোট করে দেখবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা কারো প্রতি যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হবে না।” (সূরা বাক্বার, আয়াত ২৭৮-২৮১)

এখানে আল্লাহ বলেছেন, যে সুদ কারবার করে তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হতে বলেছেন। এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন,

“কিয়ামতের দিন সুদখোর ব্যক্তি কবর থেকে শয়তানে আচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো উঠে আসবে এবং ফেরেশতারা তাকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে বলবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।”

সুতরাং এটা খুবই মারাত্মক গুনাহের কাজ। এখন এই সুদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ এখন সুদের সাগরে নিমজ্জিত।

৭. মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারী :

অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ غَدَاوًا وظَلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾
 অর্থ: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস
 করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা
 হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে
 আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।
 আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে
 খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই
 সহজসাধ্য।” (সূরা নিসা, আয়াত ২৯-৩০)

৮. জালিমদের সাথে একাত্মতা পোষণকারী বা সহযোগী :

যদি কোন যালিম কিংবা অত্যাচারী রাজা, প্রেসিডেন্ট বা নেতার প্রতি
 আপনার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা থাকে তবে আপনি হাশরের দিন তাদেরই সাথে
 অবস্থান করার ঝুঁকির মধ্যে আছেন। আমাদের উচিত এসব যালিম এবং
 স্বৈরশাসক হতে দূরে থাকা এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন না দেয়া।
 আর যদি আমরা তা করি তাহলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন
 ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

অর্থ: “আর তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না। তাহলে জাহান্নামের
 আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ
 ছাড়ার আর কোনো অভিভাবক বা সহায়কারী নেই।” (সূরা হুদ, আয়াত
 ১১৩)

উক্ত আয়াতে ‘যালিমিন’ দের কথা বলা হয়েছে যারা কিনা সীমালঙ্ঘন করে
 এবং অত্যাচার করে। কিন্তু এটার অর্থ এও যে, যারা পাপের প্রচার-প্রসার
 করে থাকে। আমাদের উচিত তাদের কাজের প্রতি আমাদের অসমর্থন
 বোঝাতে তাদের নিকট হতে দূরে থাকা।
 এখানে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, আমি যতক্ষণ না কোন খারাপ
 কাজ করছি, ততক্ষণ ঠিক আছি! কেউ যতক্ষণ না কোন ভুল করছে
 ততক্ষণ সে ঠিক আছে। কিন্তু আসলে তা ঠিক নয়। আপনি হয়ত নিজে
 জুলুম-অন্যায় করছেন না, কিন্তু যারা এসব পাপ করছে আপনি তাদের
 সাথে আছেন, তাদের কাজকে অগ্রাহ্য করছেন না; অধিকন্তু তাদের সাথে
 সুন্দর দিন কাটাচ্ছেন। এটাই একটা গুনাহের কাজ!
 উদাহরণস্বরূপ অত্যাচারী যালিম শাসকের প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে কাজ
 করা। আপনি নিজে অত্যাচার কিংবা যুলুম করছেন না, তবে যারা করছে
 তাদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আছেন। এটা খুবই মারাত্মক!

আব্বাসীয় খিলাফতের বিভিন্ন সময় খলীফা হিসেবে ভালো লোকও ছিল
 এবং অনেক মন্দলোকও ছিল। তো একজন পুলিশ অফিসার ইমাম
 আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল,
 “যারা যালিম শাসকের সাহায্যকারী তার মধ্যে কি আমিও গণ্য হব?”
 আহমদ ইবন হাম্বল উত্তরে বললেন “না, তুমি তো নিজেই একজন
 যালিম। যারা সাহায্য করছে তুমি তাদের মধ্যে গণ্য হবে না বরং তুমি তো
 নিজেই এই যুলুমবাজ ও অত্যাচারী শাসনের একজন! নিরাপত্তা বাহিনীর
 সদস্য যারা কিনা এটাকে টিকিয়ে রাখছে। অর্থাৎ, তুমি শুধুমাত্র তাদের
 অংশই নও, বরং তুমি নিজেও একজন যালিম।

৯. পোশাক পরিধান সত্ত্বেও নগ্ন মহিলা এবং চাবুকওয়ালা পুরুষ :
 এটা কিয়ামতের একটি নিদর্শনও বটে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
 সাল্লাম বলেছেন, দু' শ্রেণীর লোক জাহান্নামে প্রবেশ করতে যাচ্ছে
 যাদেরকে এখনো তিনি দেখেন নি। এদের একটি হল ওসব মহিলারা যারা
 পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন। অর্থাৎ তাদের পোশাকগুলো এমন

সংকীর্ণ এবং আঁট সাট হবে যে শরীরের গঠন ও সৌন্দর্যের স্থানগুলো বাহির হতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,
 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...
 ...وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتٍ غَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
 الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْجَذْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
 كَذَا وَكَذَا.

অর্থ: “হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের অন্যতম এক আলামত হলো, এমন এক শ্রেণীর মহিলা দেখা যাবে, যারা হবে ‘কাসিয়াত আরিয়্যাত’ (পোশাক পরিহিতা, কিন্তু নগ্ন)...।” (মুসলিম)

২য় শ্রেণীতে সেসকল পুরুষদের কথা বলা হয়েছে যা ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি। ওসব নিরাপত্তাবাহিনী যাদের হাতে চাবুক থাকবে এবং এটা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কারের পূর্বেই অতীতে মুসলিম বিশ্বে ঘটেছে। এমন নিরাপত্তা বাহিনী ছিল যারা হাতে চাবুক ও লাঠি নিয়ে বের হয়ে লোকজনের ওপর যুলুম-নির্যাতন করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তাদের শাস্তি হল জাহান্নাম।

১০. প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণকারী :

বুখারীতে একটি হাদীস আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করবে একটি বিড়ালের জন্য আর অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন, এক মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করবে একটি কুকুরের জন্য।

তাই প্রাণীদের প্রতি ভালো বা নিষ্ঠুর আচরণ আখিরাতে আপনার অবস্থান পাল্টে দিতে পারে। এ হতে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের কোন আমলই ছোট করে দেখা উচিত নয়। কারণ আমরা জানি না ঠিক কোন আমলের কারণে আমরা আখিরাতে ক্ষমা পেয়ে যেতে পারি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঐ মহিলা বিড়ালটিকে বন্দি করে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে বাহিরেও যেতে দেয় নি এমনকি কোন খাবারও দেয় নি। একসময় বিড়ালটি মারা গেল। আর এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর অন্যদিকে ঐ মহিলা একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে তার জীবন বাঁচিয়েছে, আর তাই সে জান্নাতে যাবে।

১১. পার্থিব উদ্দেশ্যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারী :

কেউ কুরআন শিখছে, ফিকহ কিংবা শারিয়াহ অধ্যয়ন করছে, কিন্তু এই জ্ঞান অর্জন তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে। ইরশাদ হয়েছে,
 عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ.

অর্থ: “হযরত কাসীর ইবনে কায়স রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা‘আলা তার বেহেশতের পথকে সহজ ও সুগম করে দেন এবং আল্লাহ তা‘আলার রহমতের ফেরেশতারা তাদের সম্মানে স্বীয় ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন।” (মিশকাত)

তথাপি এমন লোক আছে যারা পার্থিব উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে। এতে তারা যেন ভালো বজ্রা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে পারে, নেতৃত্বের আসনে বসতে পারে ইত্যাদি। এসব কিছুই উদ্দেশ্য হল দুনিয়া। মূল হাদীসটি ইবনে মাজায় রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَرِ عَرَفَ الْجَنَّةَ.

অর্থ: “হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্টি অশ্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে জান্নাতের দ্বারও পাবে না (অর্থাৎ সে জান্নাতের দ্বারে কাছেও যেতে পারবে না)।” (ইবনে মাজা)

১২. অহেতুক বৃক্ষ নিধন :

অহেতুক বৃক্ষ নিধনও জাহান্নামে যাবার কারণ। সিদরাহ এক ধরণের গাছ যা আরবে জন্মায়। হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

عن عبد الله بن حبيش رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود
অর্থ: “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সিদরাহ গাছ কাটবে, আল্লাহ তার মাথাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।” (আবু দাউদ। মিশকাত হাদীস নং ২৯৭০।)

আবু দাউদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা করে হয়েছিল। গাছ কাটার ফলে জাহান্নামে যেতে হবে? আবু দাউদ উত্তরে বলেছিলেন,

يعني : من قطع سدره في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها؛ صوب الله رأسه في النار.

অর্থ: “এই সিদরাহ গাছ পথিককে ছায়া দেয়, প্রাণীদের খাদ্যের যোগান দেয়। সুতরাং যদি কেউ এ গাছ কোন কারণ ছাড়াই কেটে ফেলে তবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” (মিরকাতুল মাফাতীহ)

এটা আমেরিকার বৃক্ষ সংরক্ষণ আইনের চাইতেও অনেক কঠোর।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আপনি সাধারণত একটা গাছ কেটে ফেললেন আর এ জন্যই আপনাকে জাহান্নামে যেতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় কিংবা গ্রহণযোগ্য কারণ থাকে তখন আপনি কাটতে পারেন, এতে কোন সমস্যা নেই। উদাহরণস্বরূপ জ্বালানী কাঠের প্রয়োজনে, নির্মাণকাজ ইত্যাদি। হাদীসটি বিনা কারণে কিংবা হয়ত খুব সামান্য কিছু কাঠের জন্য কেটে অপচয় করার কথা বলা হচ্ছে।

বিশেষ করে আরবে এমনিতেই গাছের সংখ্যা কম। কাউকে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য কিংবা কোন প্রাণীকে খাবার সংগ্রহের জন্য অনেক দূর পাড়ি দিতে হয়। এ অবস্থায় আপনি এ গাছগুলো কেটে ফেলে অনেক বড় ক্ষতি করছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা আরবের নিষ্প্রাণ মরুভূমির ক্ষেত্রে বলেছেন। শহরাঞ্চলের জন্য এর হুকুম ভিন্ন।

১৩. আত্মহত্যা :

আত্মহত্যার কারণেও মানুষ জাহান্নামে যাবে। হাদীসটি বুখারীতে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرَبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

অর্থ: “হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ধারালো অস্ত্র

দ্বারা আত্মহত্যা করেছে তার কাছে জাহান্নামে সে ধারালো অস্ত্র থাকবে যার দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেটকে ফুঁড়তে থাকবে।

আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে বিষ খাইয়ে মারতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। সেখানে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে এখানে অনন্তকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলার পরেও কেন আমি তা এ অস্থায়ী ক্যাটাগরীতে নিয়ে এসেছি?

মূলত হাদীসে অনন্তকাল বলতে অনেক লম্বা সময় বুঝানো হচ্ছে। এ পাপ এতো মারাত্মক, যার ফলে জাহান্নামে অনেক লম্বা সময় ধরে অবস্থান করতে হবে যে কারণে এখানে অনন্তকাল শব্দটি ব্যবহার করা যায়, যদিও আমরা জানি যে কেউ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর ওপর মৃত্যুবরণ করলে কোন এক সময় পর হলেও সে জান্নাতে যেতে পারে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি আত্মহত্যা কতো জঘন্য একটি পাপ!

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন কে?

জান্নাতে সর্বপ্রথম যিনি প্রবেশাধিকার লাভ করবেন তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সহীহ মুসলিমে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَفْرُغُ بِأَبْوَابِ الْجَنَّةِ .

অর্থ: “আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন “হাশরের দিন অন্যান্য আশিয়ায়ে কিরামের উম্মাহর চেয়ে আমার উম্মাহই সবচেয়ে বেশি হবে আর আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব।”

লোকজনের বিচারকার্য শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

উল্লেখ্য যে এ পর্যন্ত বর্ণিত বেশির ভাগ হাদীসই সহীহ বুখারী ও মুসলিমের। কারণ বুখারী ও মুসলিমে এসব ব্যাপারে এতো হাদীস আছে যে আমাদের অন্য কোনো গ্রন্থের দিকে যাওয়ার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে নি। তথাপি অন্য হাদীসগ্রন্থসমূহ থেকে ইতিপূর্বে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি তাও সব সহীহ।

সহীহ মুসলিমের অপর একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحَ ، فَيَقُولُ الْخَارِئُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ : بِكَ أَمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ .

অর্থ: “আনাস ইবনে মালিক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন “আমি জান্নাতের নিকট এসে তাঁর দরজা খুলতে বলবো। জান্নাতের দাড়াওয়ান বলবেন, কে আপনি? আমি বলব। ‘মুহাম্মাদ’। দাড়াওয়ান বলবেন, ‘আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আপনার পূর্বে কারো জন্য দরজা না খুলি।” (সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ জান্নাতের দরজায় যিনি বছরের পর বছর ধরে পাহারা দিচ্ছেন তাকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কারো জন্য যেন দরজা খোলা না হয়।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রবেশের পর প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের মতো আশ্বিয়ায়ে কিরাম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আশ্বিয়া কিরামের পর মানব জাতির মধ্যে কে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন?

সুনান আবু দাউদের একটি হাদীসের দিকে তাকাই সেখানে ইরশাদ হয়েছে,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي مَعَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي."

অর্থ: “আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘আমার হাত ধরে জিবরাঈল আ. আমাকে জান্নাতে নিয়ে যান এবং আমার উম্মাত যে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তা দেখান। তিনি বলেন, এই সেই দরজা যা দিয়ে আপনার উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু বকর রাযি. তা শুনে বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমিও আপনার সাথে তা দেখতে পেতাম!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “ও আবু বকর! আমার উম্মাতের মধ্যে আপনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।” (সুনানু আবু দাউদ)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন এই উম্মাতের মধ্যে তিনি প্রথম প্রবেশ করবেন, তবে কিভাবে আমরা জানলাম তিনি পূর্ববর্তীসহ সকল উম্মাতের মধ্যেও প্রথমজন! এর কারণ হল অন্য একটি হাদীস তিনি বলেন “আশ্বিয়া কিরামের পর মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম হল আবু বকর সিদ্দিক রাযি.।

এই উম্মাহর ৭০,০০০ জন :

আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে অনুসরণকারী দলটি হবে মুসলিমদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সর্ব প্রথম দল। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزِدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَرَأَدَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا". أخرجه أحمد (6/1) ، رقم 22

অর্থ: “আবু বকর সিদ্দিক রাযি. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ৭০,০০০ জনকে দিয়েছেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে কোন ধরনের হিসাব ছাড়াই। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার রাতের উজ্জ্বল চাঁদের মতো আর তাদের অন্তর হবে এক।

অতঃপর আমি আমার মহান প্রতিপালকের কাছে (বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবার) এই সংখ্যাকে আরো বৃদ্ধি করতে চাইলে তিনি তাকে আরো বৃদ্ধি করে দিলেন এবং ঐ ৭০ হাজার জনের প্রত্যেকের সাথে আরো ৭০ হাজার জনকে জান্নাতে যাবার অনুমতি দিলেন।” (মুসনাদে আহমাদ)

সুতরাং এরা হল বাছাইকৃত সেই অল্প কিছু মানুষ, উম্মাহর সকল যুগ থেকে বাছাইকৃত মাত্র ৭০০০০ জন, যাদের আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা নিজে বাছাই করবেন। যখন আর প্রতিটা মানুষকে হিসেব নিকেশ এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে এই ৭০০০০ মানুষ তখন জান্নাত লাভ করবে

কোন ধরনের হিসাব নিকাশ ছাড়াই। তারা পেছনের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

কি এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন তারা, যে কারণে তারা বিনা হিসাবেই জান্নাত লাভ করবেন? তাদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে তারা সর্বান্তকরণে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও এই সংখ্যা নিয়ে বেশ খুশি ছিলেন, কিন্তু তিনি তার উম্মাহর জন্য সবসময় সর্বোত্তমটাই চেয়েছেন। তাই তিনি চেয়েছেন আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে যেন বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হয়। মুসনাদে আহমাদেই এটা বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তার উম্মাহর মধ্যে থেকে ৭০,০০০ জনকে বিনা হিসাবে জান্নাত দেয়া হবে। তখন তিনি সেই সংখ্যা যেন আরো বৃদ্ধি করা হয় সেই অনুরোধ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন প্রতি ১ জনের সাথে আরো ৭০,০০০ জন করে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমরা যদি গুণ করি তাহলে দেখতে পাই যে সংখ্যাটা হয় ৪ মিলিয়ন এবং ৯০০০০০।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অতঃপর বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহ বলেন আমি আমার তিন অঞ্জলি পরিমাণ অতিরিক্ত মুসলিমকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই সবসময় সাহাবাদেরকে তাদের সর্বোত্তমটুকু করতে বলেন যেন তারা ঐ ৭০০০০ জনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

গরীব মুহাজিরগণ

পরবর্তী যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সম্পর্কে মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়।

قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع.

فقال لهم ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا.

অর্থ: “আবু আব্দুর রাহমান রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাযি. এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় তিনজন লোক সেখানে আসলেন এবং বললেন “আল্লাহর শপথ আমাদের নিকট কোন কিছুই নেই, না কোনো খাদ্যব্যয়ের মজুদ, না চড়ার মতো কোনো প্রাণী কিংবা ধন সম্পদ।”

তাদের এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বললেন, “আমি তোমাদের পছন্দনীয় যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত আছি। তোমরা যদি আমাদের কাছে আসো তাহলে আল্লাহ তোমাদের প্রাপ্য যা রেখেছেন আমরা তোমাদের তা দিবো। যদি তোমরা চাও আমি তোমাদের অবস্থার কথা খলীফার নিকটে তুলে ধরবো, অথবা তোমরা চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো। কারণ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি “মুহাজিরীনদের মধ্যে যারা দুঃস্থ, জান্নাতের পথে তারা ধনী মুহাজিরীনদের চাইতে ৪০ বছর অগ্রগামী হবে।”

একথা শুনে লোকগুলো বললো “আমরা ধৈর্য ধারণ করলাম এবং আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।” (মুসলিম, হাদীস নং ২৯৭৯)

মুহাজিরীনদের মধ্যে যারা নিঃস্ব ছিলেন, গরীব ছিলেন তারা ধনীদের চেয়ে কেমন করে ৪০ বছর অগ্রগামী হবেন?

এই বিষয়ে মুসতাদরাকে হাকিমে একটি সুন্দর হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: - أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم، فقال: فقراء المهاجرين، يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة، ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب، وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ قال: فيفتح لهم، فيدخلون فيه أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس.

অর্থ: “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জানো যে আমার উম্মতের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম কোন দল জান্নাতে প্রবেশ করবে?

আমি বললাম, মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই সবচাইতে ভালো জানেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে ফকীর মুহাজিরীনদের জামাআত। যখন মুহাজিরীনরা জান্নাতের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছবে এবং জান্নাতের দরজা খোলার জন্য আওয়াজ করবে তখন প্রবেশ দ্বারের রক্ষীগণ মুহাজিরীনদের এ দলটিকে এতো দ্রুত জান্নাতের দরজায় আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করবে “আপনারা কি ইতোমধ্যে হিসাব নিকাশ এর ঝামেলা শেষ করে ফেলেছেন?”

তখন সেই নিঃস্ব মুহাজিরীনরা বলে উঠবে “কিসের জন্য হিসাব? দুনিয়াতে আমাদের তো কোন কিছুই ছিল না, যার জন্য আমাদের হিসাব দিতে হবে। আমরা আমাদের তরবারিগুলো আমাদের কাঁধে বহন করতাম এবং আমরা আল্লাহর জন্য মৃত্যুবরণ করেছি।

এরপর তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং তারা অন্যদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।” (মুসতাদরাকে হাকেম)

এই হাদীসটির অর্থ হল পুনরুত্থান দিবসে যে জিনিসগুলো মানুষের অপেক্ষাকে দীর্ঘায়িত করবে তাদের একটি হলো ধন সম্পদের হিসাব নিকাশ।

অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا ضَيَّعَ مِنْهُ ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ؟ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ؟ . "

অর্থ: “হযরত আবু বুরদা আসলামী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ ৪টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নড়তে পারবে না। ১. সম্পদ অর্জন ও ব্যয় সম্পর্কে- যে টাকা কিভাবে আয় করেছে এবং কিভাবে খরচ করেছে?

২. অর্জিত ইলম সম্পর্কে কি কাজে তা ব্যবহার করেছে?

৩. যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করা হয়েছে এবং

৪. জীবনকে কি কাজে লাগিয়েছে? (সে সম্পর্কে)।” (সুনানুত তিরমিযী, কিয়ামতের বিবরণ অধ্যায়। মিরকাতুল মাফাতীহ, শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ৫১৯৭)

এই বিষয়গুলো জান্নাতে প্রবেশের সময় এর সাথে সম্পর্কিত মর্যাদার সাথে নয়। কেউ একজন পরে এসেও তার আগে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবেন। বিচার দিবসে সম্পদশালীদের অনেক দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষমান থাকতে হবে। কারণ তাদের হিসেব নেওয়ার মতো সম্পদের পরিমাণ হবে অনেক বেশি।

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ
الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، بَيْنَهُمْ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَذَا اللَّهُ لِمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَذَا اللَّهُ لَهُ ،
قَالَ : " يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا ، وَغَدًا لِلْيَهُودِ ، وَغَدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى . "

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেন “আমরা সর্বশেষ উম্মাত কিন্তু বিচার দিবসে আমরাই থাকবো
সর্বপ্রথমে এবং আমরাই সর্বপ্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবো। আর আমরাই
তারা, যারা জান্নাতে সবার আগে প্রবেশ করবো। যদিও তাদেরকে
আমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিলো এবং আমাদেরকে পরে কিতাব
দেয়া হয়েছিলো...।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪১৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সর্বোত্তম উম্মাতকে শেষ সময়ের জন্য
সংরক্ষিত রেখেছেন। এমনকি নবী রাসূলদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারী হওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ
করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদেরকে এই বিরল সম্মান
দান করেছেন যা আমরা অনেকটা সহজাত হিসাবেই গণ্য করে থাকি।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ -
(ابراهيم ٧: ١٤)

জান্নাতের দরজাসমূহ

আল্লাহ বলেন

﴿ جَنَّاتٍ عَذْنٍ مَفْتَحَةٍ لَهُمْ الْأَبْوَابُ ﴾

অর্থ: “(সে উত্তম আবাস হচ্ছে) চিরস্থায়ী এক জান্নাত, যার দরজা
(হামেশাই) তাঁদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।” (সূরা সদ, আয়াত ৫০)

আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ

أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾

অর্থ: “(অপরদিকে) যারা তাদের মালিককে ভয় করেছে তাদের সবাইকে
দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে; এমনি করে যখন সেখানে
(জান্নাতের দোর গোড়ায়) তারা এসে হাজির হবে (তখন তারা দেখতে
পাবে) তার দরজাসমূহ তাদের অভিবাদনের জন্য খুলে রাখা হয়েছে, (উষ্ণ
অভিনন্দন জানিয়ে) তার রক্ষী (ফেরেশতা) তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি
সালাম, তোমরা সুখে থাকো। চিরন্তন জীবন কাটানোর জন্য এখানে
প্রবেশ করো।” (সূরা বুমার, আয়াত ৭৩)

এই অভিনন্দনকে তুলনা করুন সেই কঠোর তিরস্কার এর সাথে,
জাহান্নামীরা জাহান্নামের দরজায় পৌঁছে যা গ্রহণ করবে। জান্নাতীদেরকে
সুন্দর সব অভিবাদনে ফেরেশতারা স্বাগত জানাবে। আপনি সেই তীব্র
আনন্দের দৃশ্যটি কল্পনা করুন, জান্নাতীরা দ্রুত গতিতে ধাবিত হচ্ছে
জান্নাতের দরজাগুলোর দিকে এবং সেই সাথে তাদের কানে ভেসে আসছে
ফেরেশতাদের প্রীতিকর সব স্বাগত সম্ভাষণ।

জান্নাতে মোট ৮ টি দরজা :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي
الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ .

অর্থ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের ৮টি দরজা আছে। তার একটির নাম হল রাইয়ান। সেখান দিয়ে শুধু রোযাদার ব্যক্তিগণই প্রবেশ করবে। আর কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।” (বুখারী, হাদীস ৩০৮৪)

সাহাবারা সাওমের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সাহাবাদের একজন বলেন “আমার এই দুনিয়াতে বাস করার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই -কয়েকটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছাড়া (এই দুনিয়ায় আমার প্রিয় বিষয় হচ্ছে)-

গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনগুলোতে সাওম পালন করা, শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলোতে ইবাদত করা এবং সেই ভাইদের সাথে সময় কাটানো, যারা কথা বলার সময় বেছে নেয় সর্বোত্তম শব্দগুলোকে অনেকটা ফলের ঝুড়ি থেকে ফল বেছে নেয়ার মতো করে, তাদের কথায় কোন ধরনের অশ্লীলতা থাকবে না, অভিসম্পাত থাকবে না এবং তারা কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বার্তাও বলবে না। তিনি বলেন, এই দুনিয়াতে এই কয়েকটি বিষয় ছাড়া আমার কাছে এমন কোনো বিষয় নেই, যার জন্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
...من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل
الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب
الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة.

فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من
دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب
كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন... “যে ব্যক্তি নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাঁকে নামাযের দরজা থেকে জান্নাতে প্রবেশের আহ্বান করা হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে তাঁকে জিহাদের

দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে দাতাদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাঁকে দাতাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে তাঁকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে আহ্বান করা হবে।

আবু বকর সিদ্দিক রাযি. বলেন “হে আল্লাহর রাসূল! এমন কেউ কি হবে যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে জান্নাতে প্রবেশের আহ্বান করা হবে?” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন “হ্যাঁ হবে। আর আমি আশা করি তুমি হবে তাদের মধ্যে একজন।” (বুখারী, সাহাবাদের ফযিলত অধ্যায়, হাদীস ৩৪৬৬)

সুতরাং কল্পনা করুন আবু বকর সিদ্দিক রাযি. জান্নাতের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা থেকে আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে ডাকছেন তাদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্যে। আপনারা জানেন যখন আপনারা বাজারে যান তখন সেখানে অনেক ধরনের জিনিসপত্র থাকে এবং প্রত্যেকে আপনাকে তার দোকানে যাওয়ার জন্য ডাকতে থাকে।

সুতরাং জান্নাতের ফেরেশতারাও আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে ডাকতে থাকবে যেন তিনি তাঁদের দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করেন, কারণ তাঁরা সকলেই এই সম্মানে সম্মানিত হতে চায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এই ফেরেশতারা নিষ্পাপ আর সেই নিষ্পাপ ফেরেশতারাও আবু বকর সিদ্দিক রাযি. কে ডাকতে থাকবে তাঁদের নিকট দিয়ে যাওয়ার জন্য।

মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে সৃষ্টির নিকৃষ্টতম হওয়ার। এতটাই নিকৃষ্ট যে পশুর চেয়েও অধম হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ بَلِّ
هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

অর্থ: “আর জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি বহু জিন ও মানুষ। তাদের রয়েছে অন্তর, কিন্তু তারা তা দ্বারা বুঝে না। তাদের রয়েছে চোখ, কিন্তু

তারা তা দ্বারা দেখে না। তাদের রয়েছে কান, কিন্তু তারা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুর্দশ গবাদি জন্তুর মতো বরং তারা চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল।” (সূরা আ'রাফ ৭, আয়াত ১৭৯)
এই আয়াতে কিছু মানুষকে বলা হচ্ছে- “তারা চতুর্দশ গবাদি পশুর ন্যায়। না তারা এর চেয়েও নিকৃষ্ট।”

আবার তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম হওয়া সম্ভব মানুষের পক্ষে। তাদের মধ্যে কতককে আবার ফেরেশতাদের চেয়েও উঁচু মর্যাদায় সম্মানিত করা হবে।

৮ টি দরজা দিয়ে প্রবেশ :

৮ টি দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করার দুটো পদ্ধতি আছে :

১) এই হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে বুখারীতে।

عَنْ عِبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. وَزَادَ أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ. (متفق عليه)

অর্থ: হযরত উবাদা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে এই সাক্ষ্য দিবে যে এক আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল, ঈসা আ. তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ, এবং আরো সাক্ষ্য দিবে যে জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই ব্যক্তিকে জান্নাতের আটটি দরজা দিয়ে আহবান জানাবেন।” (বুখারী, হাদীস ৩৪৩৫। মুসলিম, হাদিস ২৮)

এই হাদীসটিতে গভীর এবং সুদৃঢ় ঈমানের কথাই বলা হচ্ছে।

২) এই হাদীসটি বর্ণিত আছে মুসলিম এ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.)

অর্থ: হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওয়ু করার পরে বলে ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।’ তাহলে তাঁর জন্য বেহেশতের ৮ টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোন দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে।” (মুসলিম। মুসনাদে আহমাদ)

এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

-এটি ওয়ুর পরবর্তী দু'আ। আমাদের উচিত সব সময় এই দু'আর ওপর আমল করা।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, উল্লিখিত দু'টো হাদীসেই শাহাদার বাক্যগুলো রয়েছে। সুতরাং এই কালিমার তাৎপর্য অনেক। কিন্তু কোন

ব্যক্তির এই বাক্যগুলো শুধু মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়। তাকে এই কালিমার ওপর নিশ্চিত এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও স্থাপন করতে হবে।

জান্নাতের দরজাসমূহের দূরত্ব

মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন “জান্নাতের প্রতিটি দরজার প্রশস্ততা হবে মক্কা ও হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।” এই দূরত্ব বলতে দরজার চৌকাঠের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বোঝানো হচ্ছে সমগ্র দরজার দূরত্বকে নয়। এই দূরত্ব অনেক বিশাল দূরত্ব, প্রায় ১০০০ মাইলেরও বেশি। আল্লাহই ভালো জানেন ইহা একটি অনুমান মাত্র।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَا بَيْنَ الْمَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. وَلِيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمَ وَهِيَ كظيظ من الزحام.

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের দরজার দুই পাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ৪০ বছরের হাঁটা পথের সমান। এমন একটা দিন আসবে যেদিন দরজাগুলো ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।” (মুসনাদে ইমাম আহমাদ, মুসলিম)

অর্থাৎ জান্নাতের রাস্তাগুলো এতটাই প্রশস্ত হবে যে প্রতিটি দরজা ৪০ বছর হেঁটে অতিক্রম করতে হবে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “এমন একটা দিন আসবে যেদিন দরজাগুলো ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।”

বিচার দিবসে এত বেশি পরিমাণ লোক সেই দরজাগুলো দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে যে সেগুলো ভীড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যদিও প্রতিটি দরজা এতো প্রশস্ত হবে যে তার দূরত্ব হেঁটে অতিক্রম করতে চাইলে ৪০ বছর সময় লাগবে।”

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

অর্থ: “আর যারা মহান আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারণাও করো না। তারা জীবিত এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯)

যারা বিচার দিবসের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছে

১. আশ শাহীদ
২. বাচ্চারা যারা অতি অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে।
৩. আর যারা ইতোমধ্যেই জান্নাতে ছিলেন? আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: “আর আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ওখানে যেখান থেকে যা চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাকো। কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” (সূরা বাকার, আয়াত ৩৫)

আর শহীদদের ব্যাপারে সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। মাসরুফ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কে আমরা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, (এই আয়াত দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে? শহীদরা কিভাবে জীবিত ও কিভাবে তারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয়িকপ্রাপ্ত হন?)

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

অর্থ: “আর যারা মহান আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাঁদেরকে তোমরা মৃত বলে ধারণাও করো না। তারা জীবিত এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয়িকপ্রাপ্ত।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯)

উপরোক্ত এই আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখানে আসলে কি বলা

হচ্ছে? শহীদগণ কিভাবে জীবিত ও মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয়িকপ্রাপ্ত? তখন তিনি বললেন, আমি এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أَرْوَاهُمْ فِي أَجْوَابٍ طَيَّرَ خُضْرًا، لَهَا قَنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. (رواه مسلم في صحيحه)

অর্থ: “এ বিষয়টি আমরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেন, শাহাদাত বরণ করার পর শহীদদের রুহগুলোকে সবুজ বর্ণের পাখির পেটের ভেতরে স্থানান্তরিত করে দেন। তারা আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতি বা প্রদীপের মধ্যে অবস্থান করেন। সেখান থেকে তারা জান্নাতের যে কোনো স্থানে ভ্রমণ করতে পারেন। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে করে তারা সেই প্রদীপের কাছে ফিরে আসেন।” (মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, এরপর তাদের রব মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা শহীদদেরকে সম্বোধন করে বলেন, “তোমরা কি কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করছো? চাইলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারো।” একথা শুনে শহীদগণ বলেন, “আমরা আর কোন জিনিষের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবো, আর আমরা কি চাইবো? আমরা তো জান্নাতের যে কোনো স্থানে ইচ্ছা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছি (আমাদের জন্য এর চাইতে আর কি চাওয়ার থাকতে পারে?)

কিন্তু তারপরও আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা তাদেরকে তিন তিনবার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করবেন যে তারা আর কিছু চায় কি না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শহীদগণ যখন দেখবেন যে মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বারবার তাঁদেরকে একই প্রশ্ন করছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে উত্তর আশা করছেন তখন তাঁরা বলবেন, “হে আমাদের রব! সম্ভব হলে আমরা একটি ইচ্ছা পোষণ করতে পারি, আর তা হলো আমাদের রুহকে আমাদের দেহে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া

হোক। আমরা আবারও আপনার পথে জিহাদ করে শহীদ হতে চাই। (-যা আর হবার নয়)”

অতঃপর যখন আল্লাহ দেখলেন যে শহীদদের আর কোনো চাহিদা নেই তখন তিনি তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিলেন।

অপর একটি সনদে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَخِي جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ. تَرُدُّ أُنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى فَنَادِيلٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ.

অর্থ: “হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উহদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শাহাদাতবরণ করেছে, তখন তাঁদের আত্মাসমূহকে সবুজ বর্ণের পাখির পেটের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতঃপর সেই আত্মাসমূহকে জান্নাতের নহরসমূহের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল আহরণ করে পুনরায় আরশের নীচে বুলন্ত প্রদীপে গিয়ে অবস্থান করে।” (আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ শহীদ ব্যক্তিদের জন্য স্পেশাল ও বিশেষ সম্মান এটা যে তাদের রুহকে শাহাদাতের সাথে সাথেই একটি সবুজ বর্ণের জান্নাতী পাখির অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করে সেই পাখিটিকে জান্নাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সে তখন জান্নাতে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ধরনের নায-নেয়ামত উপভোগ করতে থাকে।

কারা তাদের আবাসস্থল দেখতে পাবে?

আমরা জানি যে কবরে দু’টি জানালা থাকবে। তার মাধ্যমে কবরে অবস্থানকারী ব্যক্তি তার চূড়ান্ত আবাসস্থল দেখতে পাবে। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ غُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সকাল এবং সন্ধ্যায় তার সামনে তার চূড়ান্ত গন্তব্য ও আবাসস্থলকে উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তাহলে জান্নাতীদের মধ্যে তাকে দেখানো হয়। আর যদি সে জাহান্নামী হয় তাহলে তাকে জাহান্নামীদের মধ্যে তার অবস্থান দেখানো হয়। এরপর তাকে বলা হয়, এটাই হচ্ছে তোমার চিরস্থায়ী ও চূড়ান্ত আবাসস্থল -কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ তোমাকে পুনরুত্থিত করার পর। (এর আগ পর্যন্ত এখানে কবরেই থাকতে হবে। এরপর তুমি তোমার চিরস্থায়ী আবাসে চলে যাবে)।” (বুখারী, হাদিস ১৩৮৯, মুসলিম, হাদিস ২৮৬৬)

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে নিজেদের চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত বানানোর তাওফীক দিন। আমীন।

এই উম্মত থেকে কতজন জান্নাতে যাবে

আলোচনা হচ্ছিলো জান্নাতে প্রবেশ সম্পর্কে। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হলো এই উম্মত থেকে কতজন জান্নাতে যাবে?

এ বিষয়ে প্রথমেই বুখারী শরীফের একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . غُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأُمَمِهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ مُوسَى مَعَهُ كَبْكَبَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَعْجَبُونِي فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَقِيلَ : هَذَا أَخُوكَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ : فَقُلْتُ : فَأَيْنَ أُمَّتِي ؟ قَالَ : فَقِيلَ : انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ فَتَنْظُرْتُ فَإِذَا الظَّرَابُ قَدْ سَدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ ، قَالَ ثُمَّ قِيلَ : انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ فَتَنْظُرْتُ فَإِذَا الْأَفْقُ قَدْ سَدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ ، فَقِيلَ لِي : أَرْضَيْتَ فَقُلْتُ : رَضِيتُ يَا رَبِّ رَضِيتُ يَا رَبِّ قَالَ : فَقِيلَ لِي : فَإِنَّ مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ،

অর্থ: “হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মিরাজের রাতে আমাকে কিছু লোকের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। ফেরেশতারা আমাকে দেখালেন, (কিয়ামতের দিন) কি ঘটবে?

আমি দেখলাম আমার সামনে দিয়ে একজন নবী তিনজন উম্মত নিয়ে যাচ্ছেন। আরেকজন নবীকে অনুসরণ করছে একটি দল। আরেকজন নবীর সাথে যাচ্ছে একটি ছোট দল। আর সেখানে কিছু নবী এমন ছিলেন যাদের কোন অনুসারীই ছিল না।

এমতাবস্থায় আমার পাশ দিয়ে হযরত মুসা আ. বনী ইসরাঈলের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে অতিক্রম করছিলেন যা আমাকে খুব আশ্চর্যান্বিত করলো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা?

জান্নাত ও জাহান্নাম ৯৯

তখন আমাকে বলা হলো, ইনি হচ্ছেন হযরত মুসা আ. এবং তার সাথে বনী ইসরাঈলের লোকজন।

এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমার উম্মাত কোথায়?

তখন আমাকে বলা হলো আপনি ডান দিকে তাকান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘এরপর আমি অনেক মানুষের একটি দল আসতে দেখলাম এবং ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি আমার উম্মতের দল?’

ফেরেশতা বলল, ‘না, তবে ঐ দিকে তাকান’। ‘আমি দিগন্তরেখায় তাকালাম আর মানুষের বিশাল একটা দল দেখতে পেলাম। তখন জিবরাঈল আ. আমাকে বললেন, তারাই আপনার উম্মত।

এরপর আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি এবার সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমি বললাম, হে আমার রব! আমি আপনার ওপর সন্তুষ্ট। হে আমার রব! আমি আপনার ওপর সন্তুষ্ট।

তখন আমাকে বলা হলো, এই উম্মাতের মধ্যে প্রথম কাতারে আছে ৭০ হাজার এমন সজ্জন ব্যক্তি, যাদের কোন হিসাব-নিকাশ লাগবে না। তারা কোন শাস্তির মুখোমুখিও হবে না।” (বুখারী শরীফের ২:৪১, ৩:৫)

এ বিশাল দলে ৭০ হাজার এমন লোক থাকবে যাদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে। এ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা অন্য হাদীসেও এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি ফেরেশতাদের সাথে ছিলাম। একজন ফেরেশতা বলল, ঐ দিকে তাকান। আমি ঐ দিকে তাকালাম এবং দেখলাম। আমি দেখলাম ঐ দিকে মানুষের ভীড়ে দিগন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। এরপর তারা আমাকে অন্য দিকে তাকাতে বলল। আমি অন্যদিকে তাকালাম। সেদিকেও মানুষের ভীড়ে দিগন্ত ছেয়ে গেছে! অসংখ্য মানুষ। অতঃপর আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা‘আলা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি সন্তুষ্ট? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ আমি সন্তুষ্ট, আমি সন্তুষ্ট। এরপর আল্লাহ- বলেন, আর এ বিশাল মানুষের সাথে

সাথে আছে ৭০হাজার এমন সজ্জন ব্যক্তি যাদের কোন জবাবদিহিতা নেই, তারা কোন শাস্তির মুখোমুখিও হবে না।

চিন্তা করুন একজন নবী যিনি সারা জীবন পৃথিবীতে দাওয়াতী কাজ করলেন অথচ শেষ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিও তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে নি। এটা খুবই কষ্টের। আপনারা জানেন, এটা খুবই হতাশার কথা। যখন আপনি একটি কাজ করে যাচ্ছেন আর দেখছেন, তার কোন ফলাফল নেই। ব্যাপারটা অত্যন্ত হতাশার। হযরত নূহ আ. এর কথা একবার কল্পনা করুন। তিনি দিন-রাত দাওয়াতী কাজ করেছেন; দিনের পর দিন। সাড়ে নয়শত বছর। অথচ একজনও তাঁকে সমর্থন দেয় নি। এরপরেও টিকে থাকা কিভাবে সম্ভব? কিভাবে লেগে থাকা সম্ভব?

তিনি কী ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন?

কেননা আমরা যে আন্দোলন করছি তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি। যদি আপনি কিছু করতে থাকেন আর বারবার মানুষ তার বিরোধীতা করতেই থাকে, আপনার দাওয়াত অস্বীকার করতেই থাকে, আপনার বিরুদ্ধে বলতে থাকে, আপনাকে বয়কট করে, আপনাকে আঘাত করে তাহলে এভাবে বেশি দিন চলতে পারে না। কিন্তু আশ্বিয়ায়ে কিরামের সাথে এসব কিছুই ঘটেছে। কিন্তু তাদের দাওয়াহ থামে নি। এটি একটি অলৌকিক ব্যাপারও বটে। তাদের নবুওয়াতের পক্ষে এটাও একটা মুজিবা! নূহ আ. এর সাড়ে নয়শত বছর এমনই ঘটেছিল।

তাই আমরা দেখছি কিয়ামতের দিন একজন নবী হেঁটে যাচ্ছেন অথচ তাঁর সাথে কোন অনুসারী নেই।

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতদের দেখলাম, আর তাদের সংখ্যা ও চেহারা দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট। তারা সংখ্যায় যমীন আর পর্বতমালা ভরে দিয়েছে, যেদিকেই আমি তাকিয়েছি তাদের দেখতে পেয়েছি। সমতল, পাহাড় ও পর্বতমালাসহ সব জায়গায় তারা ভীড় করেছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি খুবই মুগ্ধ এবং আনন্দিত হয়েছিলাম আমার উম্মতদের দেখে। তাই একটু কল্পনা করুন কিয়ামতের দিন উম্মতের বিশালতা দেখে কত খুশি হবেন।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই চান তাঁর উম্মত বিশাল হোক। তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تناكحوا ، تناسلوا ، تكاثروا فإني مَبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه أحمد).

অর্থ: “বিয়ে করো এবং বেশি বেশি সন্তান নাও; কেননা আমি কিয়ামতের দিন এ নিয়ে গর্ব করবো।” (মুসনাদে আহমাদ)

কিয়ামতের দিন উম্মাতে মুহাম্মাদীর সংখ্যা যেনো অধিক হয় সেজন্য তিনি আমাদের আদেশ করছেন বেশি সন্তান নিতে যাতে করে উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই ইনশাআল্লাহ চলুন আমরা এক বৃহৎ উম্মত তৈরি করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেন, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ বলবেন, ‘হে আদম! আদম আ. প্রতিউত্তরে বলবেন, লাভবাইক, আমি হাযির। আপনিই সকল কল্যাণের মালিক!

আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামের লোকদের বের করে নিয়ে আসো। আদম আ. বলবেন, হে আল্লাহ কতো সংখ্যক মানুষ আনবো? আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা তাঁকে বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে কতো বিশাল সংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যাই হোক যখন এভাবে জাহান্নামীদের বের করে আনা হবে, জান্নাতের লোকদের পৃথক করা হবে, এটা নিয়ে তখন সেখানে নবীগণের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা চলবে। উত্তম প্রতিযোগিতা। কার উম্মত বেশি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে, এই প্রতিযোগিতা!

আপনারা জানেন, মেরাজের রাতে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূসা আ. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মূসা আ. কেঁদেছিলেন, তিনি কেন কেঁদেছিলেন? মূসা আ. বলেন, তার কারণ, এক যুবককে আমার পরে পাঠানো হয়েছে আর তার উম্মতের সংখ্যা অনেক। তারা

আমার আগে জান্নাতে যাবে আর তারপর আমার উম্মত যাবে। তাই সে সময় পর্যন্ত অনুসারীর দিক থেকে তিনি প্রথম ছিলেন।

কেননা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের পর বৃহৎ উম্মত হল বনী ইসরাঈল। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ: “হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ করো আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের ওপর করেছি এবং (স্মরণ করো) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের ওপর সেটা।” (সূরা বাকারা, আয়াত ৪৭)

বনী ইসরাঈলের ইহুদীরাও এই বিষয়টি নিয়ে গর্ব করতো। তারা নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলতো। আসলে এটা সত্যও ছিলো। কিন্তু এটা বলা হতো বহু সময় আগে। এক সময় তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলো, কারণ তখন তারা সত্যের পতাকাবাহী ছিল; তারা ছিল নবীদের উম্মত; তারা ছিল এমন মানুষ যারা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তারা ছিল প্রথম উম্মত যারা জিহাদ করেছিল। অন্য কোন নবী আ.কে যুদ্ধ-জিহাদ করতে হয় নি। হযরত মূসা আ. এর আগে অতীতে জিহাদের ময়দানে শারীরিক যুদ্ধের বিষয়টি ছিলো না।

এর আগের নবীদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তারা দাওয়াতী কাজ করতেন, এরপর কিছু মানুষ ঈমান আনতো, বাকিরা অবাধ্যতায় মেতে উঠতো এবং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা নবীদের বলতেন, তার উম্মতসহ হিজরত করতে তারপর আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা সত্য অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করে দিতেন আযাবের মাধ্যমে।

কিন্তু হযরত মূসা আ. এর সময় থেকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর নতুন বিধান প্রকাশ করেন। তাই তারা প্রথম জিহাদকারী উম্মত।

তবে জিহাদকারী সবচেয়ে মহান উম্মত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত। আমরা স্মরণ করতে পারি, বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর পরামর্শ চাইলে মিকদাদ ইবনে আমর দাঁড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলবো না যে ‘হে মূসা যাও তোমার প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদ করো; আমরা এখানে অপেক্ষা করবো।’ (সূরা আশশূরা ৫:২৪)

আমরা আপনাকে বলতে চাই ‘যান আপনার প্রভুর ভরসায় লড়াই করুন; আমরাও আপনার সাথে লড়াই করবো।’

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. পরবর্তীতে আফসোস করে বলতেন, আমি ঘটনাটি দেখেছি, আর তারপর আফসোস করেছিলাম যদি ওই মুহূর্তে সেই লোকটি আমি হতে পারতাম। তিনি বলেন, যখন মিকদাদ ইবনে আমর রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেই কথাগুলো বললেন, আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমি মনে মনে কামনা করতাম ওই লোকটি যদি আমি হতাম। কেননা সেটা ছিল সঠিক সময়ে বলা বিশেষ কিছু কথা। এটা ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা যা আজও আমরা স্মরণ করি।

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ দেয়ার মতো একটি শক্তিশালী কথা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মতামত চাচ্ছিলেন এবং তিনি তাঁদের কাছ থেকেই শুনতে চাচ্ছিলেন। তাই আপনারা বুঝতেই পারছেন যে নেতা যখন দেখবেন, তাঁর অনুসারীরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণে প্রস্তুত, তখন তিনি কতোটা খুশি হন। আরেকজন সাহাবী বললেন, আপনি যদি পরীক্ষা নিতে চান নিন। এমনকি আপনি যদি নদীতে যুদ্ধ করতে নামেন, আমরাও আপনার সাথে নেমে যাব, আপনাকে অনুসরণ করব।

আমরা বলছিলাম, যখন আল্লাহ আদমকে ডেকে বলবেন, জাহান্নামীদের বের করতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে ডেকে বলবেন, হে আদম। আদম আ. উত্তরে বলবেন, আপনিই সকল কল্যাণের মালিক।

আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামের লোকদের বের করে নিয়ে আসো। আদম আ. বলবেন, হে আল্লাহ কতো মানুষ আনবো?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে বলবেন, প্রতি এক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জনকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা যখন ঘটবে তখন শিশুদের চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে আর প্রত্যেক গর্ভবতী নারী অকালপ্রসব করবে এবং দেখবে মানুষ মাদকাসক্তের মতো আচরণ করছে যদিও তারা মাদকাসক্ত হবে না, তারা হবে আল্লাহর অভিসম্পাত প্রাপ্ত।

সাহাবীগণ যখন শুনলেন যে এক হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জনই জাহান্নামে যাবে মাত্র একজন নাজাত পাবে তখন তারা খুবই শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সেই পছন্দনীয় একজন কে হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জেনে রাখো যে সে একজন হবে তোমাদের আর নয়শত নিরানব্বই জন হবে ইয়াজুজ-মাজুজদের। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহর কসম, জান্নাতের এক চতুর্থাংশই হবে তোমরা। আমরা চিৎকার দিয়ে বললাম, আল্লাহু আকবার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আশা করি যে তোমরা হবে জান্নাতের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী। সাহাবাগণ বলেন, আল্লাহু আকবর। রাসূলুল্লাহ সা এরপর বলেন, তোমরা হবে জান্নাতের অর্ধেক। সাহাবাগণ বলেন, আল্লাহু আকবর।

তিনি আবারো বলেন, তোমরা মুসলমানেরা অমুসলিমদের তুলনায় একটি সাদা ষাড়ের কালো চুল অথবা একটা কালো ষাড়ের সাদা চুল। সুতরাং কাফিরদের তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা কম, কিন্তু জান্নাতবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ হবে এই উম্মতের মধ্য থেকে।

এ সংক্রান্ত আরো হাদীস আছে। যেমন তিরমীজি শরীফের এক হাদীস-

عن ابن بريدة عن أبيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ صَفٌّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنَ سَائِرِ الْأُمَمِ.

অর্থ: হযরত ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ একশ' বিশটি রাস্তায় ভাগ হবে যার আশিটি রাস্তা হবে এই উম্মতের। আর বাকি চল্লিশটি রাস্তা হবে অন্য সকল উম্মতের।" (তিরমীযী, হাদীস নং ৩৪৬৯)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم، أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد . رواه مسلم .

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি হবো জান্নাতের প্রথম মধ্যস্ততাকারী (শাফায়াতকারী) আর নবীগণের মধ্যে কোন নবীই এতো অধিকসংখ্যক উম্মতসহ পরীক্ষিত হবেন না যেমন আমি পরীক্ষিত হয়েছি। আমার উম্মত হবে সবচেয়ে বেশি। আর নিশ্চয়ই সেখানে নবীগণের মধ্যে এমন একজন নবী হবেন যিনি তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে একজন দ্বারা পরীক্ষিত হবেন।" (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيََتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, প্রত্যেক নবীকে মোজেযা দেয়া হয়েছিল। কেননা তারা তাতেই বিশ্বাস করতো। কিন্তু আমাকে দেয়া হয়েছে

‘কালামুল্লাহ’ তথা স্বর্গীয় বাণী যা আল্লাহ আমার ওপর নাযিল করেছেন। তাই আমি আশা করি আমার অনুসারীরা সংখ্যায় অন্য নবীর অনুসারীদের ছাড়িয়ে যাবে।” (সহীহ বুখারী)

কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোজেযা অন্য রকম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোজেযা হলো কুরআন। যেখানে অন্য নবীদের মোজেযা ছিল একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমিত। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোজেজা যেহেতু পবিত্র কুরআন যা শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে সুতরাং এর মাধ্যমে লোকেরা ঈমান আনবে এবং উন্মাদে মুহাম্মাদিয়ার সংখ্যা বাড়তে থাকবে।

জান্নাতের সফর

এখন আমরা জান্নাতের বিষয়াবলীর আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা কল্পনায় জান্নাতের একটি ভ্রমণ সেরে নিই। বাস্তবে না হলেও আমরা এখন কল্পনার মাধ্যমে এমন একটি সফরে বের হতে পারি। মনে করুন যে আমরা জান্নাতের সফর করতে যাচ্ছি, ঘুরতে যাচ্ছি, জান্নাতের বিভিন্ন নায নেয়ামত আমরা ঘুরে ঘুরে দেখব এবং আমাদের পথ দেখানোর জন্য গাইড হিসেবে আমরা একজন ব্যক্তিকে অনুসরণ করব, যিনি আমাদের জান্নাতের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও আমরা আমাদের গাইডের সাথে কোন ভিডিও ক্যামেরা যুক্ত করে দিতে পারছি না, তবে আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের যা বর্ণনা দিয়েছেন তার আলোকে একটি দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার।

আমাদের এই সফরের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কল্পনা শক্তিকে ব্যবহার করবো। আমরা মনে করবো, যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং জান্নাতের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন তিনি আর কেউ নন, আপনি নিজেই। আমরা আপনাকে অনুসরণ করে আপনার সাথে জান্নাতে ঘুরতে যাচ্ছি, কাজেই আপনি চিন্তা করবেন যে, আমরা যে যে স্থানের বর্ণনা

দিচ্ছি, আপনি নিজে সেখানে আছেন, এ কাজে আপনি আপনার চিন্তা শক্তি ব্যবহার করুন।

কেননা এটা আপনার জন্যই ভালো। এটা খুবই উপকারী। আপনি যত জান্নাতের সাথে সম্পৃক্ত হবেন, আশা করবেন, যত জাহান্নামকে ভয় করবেন, ততই আপনি আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

অর্থ: “তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়।” (সূরা সাজদা, আয়াত ১৬)

তাই তারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে ‘আজর’ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, “একজন মুমিন বা বিশ্বাসী মানুষের দু’টি ডানা বিশিষ্ট পাখির মতো হতে হবে। যার একটি ডানা হবে رجاء বা আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর অপরটি হচ্ছে خوف বা মহান আল্লাহর ভয়। আর এ দু’টির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, জান্নাত ও ক্ষমা প্রত্যাশা করা কিংবা শুধু মহান আল্লাহকে ভয় করা এটা যথেষ্ট নয়। বরং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।”

কাজেই আপনি মহান আল্লাহর কাছে রহমতের আশাও করবেন এবং তার আযাবের ব্যাপারে ভয়ও আপনার মাঝে থাকতে হবে। এই উভয় বিষয়টি আমাদের মাঝে এজন্য দরকার যে, যদি আপনি আশা ও ভয়ের কেবলমাত্র যে কোনো বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েন তাহলে সমস্যা দেখা দিবে। যদি কেবল আশার মাঝেই ডুবে থাকেন, কেবল অতিরিক্ত প্রত্যাশা করবেন তাহলে এটি আপনাকে অলস করে দিবে। মহান আল্লাহর ইবাদতে আপনার কোনো আশা থাকবে না, সৎকাজে কোনো গতি সম্ভব হবে না। নিষ্কৃতি হয়ে বসে থাকবেন। কারণ বেশি আশা করার ফলে আপনি মনে করবেন যে আমি যাই করি না কেন, আল্লাহ তো আমাকে ক্ষমাই করে দিবেন।

এর বিপরীত ক্ষেত্রে আপনি যদি শুধু ভয় আর মহান আল্লাহর শাস্তির বিষয়টিকে কেবলমাত্র গ্রহণ করেন আর বারবার কেবল তাই স্মরণ করতে থাকেন তাহলে আপনার মনে হবে যে কোনোভাবেই আমি হয়তো সফল হতে পারবো না, ব্যর্থ হবো। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা আমাকে পাকড়াও করবেন এবং এর ফলে আপনি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিবেন। এভাবে হতে পারে যে এক সময় আপনি অতিরিক্ত হতাশায় নিপতিত হয়ে মহান আল্লাহর ইবাদতকেই ছেড়ে দিবেন। এজন্যই মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাশা ও তার ভয় এই দু'টি বিষয়ে আমাদের সকলের ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য একটি বিষয়।

সুতরাং এখন আমরা জান্নাতের সফর শুরু করতে যাচ্ছি। তাই আপনি কল্পনা করুন যে আপনি একটি দলের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন; আর জান্নাত সত্যিকারের বিস্ময়কর জায়গা; বিস্ময়ে ভরপুর। দুনিয়াতে মানুষের তৈরি করা ওয়াভারল্যান্ডের কথা আপনারা শুনেছেন, কিন্তু সত্যিকারের ওয়াভারল্যান্ড হচ্ছে জান্নাত, যার প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয় চমকে ভরপুর এবং আপনার কল্পনাশক্তি যত ভালোই হোক না কেন, আপনি কখনোই চিন্তা করে বের করতে পারবেন না যে, আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা কত উত্তম জিনিস আপনাকে দিতে যাচ্ছেন।

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ: “কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়নাভিরাম প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।” (সূরা সাজদা ৩২, আয়াত ১৭)

সুতরাং আমাদেরকে জান্নাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যিনি, তাকে অনুসরণ করতে যাচ্ছি, এই মানুষ আপনি, আমরা আপনাকে অনুসরণ করছি, জান্নাতে প্রবেশের জন্য আপনি একটি ব্রিজের ওপর আছেন, এটা আমাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে, একমাত্র মহাসড়ক যা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

মনে করুন আপনি ব্রিজ পার হচ্ছেন এমন সময় আপনাকে থামিয়ে দেয়া হলো। দুনিয়াতে আপনি যেসব মুসলিমদেরকে চিনতেন তাদের কেউ এসে আপনাকে থামিয়ে দিয়েছে কারণ আপনি তাদের কাছে ঋণী, তারা

আপনার কাছে পাওনা দাবি করেছে। হতে পারে এই পাওনা আর্থিক, অথবা আপনি কাউকে কষ্ট দিয়েছেন, আঘাত করেছেন কিংবা আহত করেছেন, খারাপ কথা বলে কষ্ট দিয়েছেন; তারা এসে আপনাকে থামিয়ে দিয়েছে এবং এই দাবীদার সবাইকে একত্র করা হবে এবং প্রতিটি পাওনা আপনাকে পরিশোধ করতে হবে, সুতরাং এর মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের আগে আপনাকে পরিশুদ্ধ করা হবে, সকল দেনা থেকে মুক্ত করা হবে। যদি আপনি পৃথিবীতে কাউকে একটি চড় মেরে থাকেন তবে ওই ব্রীজে আপনি তা ফেরত পাবেন।

কারো সম্পর্কে কটু কথা বলে থাকলে ওই ব্রীজে আপনাকে তা ফেরত পেতে হবে। কারণ,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

-আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা পবিত্র আর তিনি পবিত্রতা ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণ করবেন না।

কেননা, জান্নাত পবিত্র আর কেউই পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ১০০% বিশুদ্ধ না হয়ে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

আর এই পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া দুনিয়াতেই শুরু হয়। কোন দুঃখ কষ্ট যা মানুষ পৃথিবীতে ভোগ করে তা তার কিছুটা গোনাহ কাটিয়ে দেয়। এটা আপনাকে পরিশুদ্ধ করবে।

আপনার অসুস্থতা ও ক্ষয়-ক্ষতি যা আপনি দুনিয়াতে ভোগ করেন; তাই আপনার পরিশুদ্ধিকরণ।

এরপর ‘সাকারাতুল মউত’ তথা ‘মৃত্যু-যন্ত্রণা’ সেটাও আপনার পরিশুদ্ধিকরণ।

কোনো আজাব যা আপনি কবরে সহ্য করবেন তাও আপনার পরিশুদ্ধিকরণ।

শেষ বিচারের দিনে অপেক্ষার সময়কাল যা হবে ৫০ হাজার বছর তা আপনার পরিশুদ্ধকরণের একটি প্রক্রিয়া। এরপর আছে এই পুলসিরাতের ব্রীজ, যেখানে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে আপনাকে আপনার দাবীদাররা

থামিয়ে দেবে এবং তাদেরকে তাদের পাওনা দেয়ার মাধ্যমে আপনি পরিশুদ্ধ হবেন। এভাবে আপনি যখন শতভাগ পরিশুদ্ধ হবেন, কেবলমাত্র তখনই আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাদীসে বলেন,

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُخَبَّسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقْصُرُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَأَحْذَهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا.

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থানের একটি ব্রীজে -যা দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে- তাদেরকে আটকানো হবে। সেখানে দুনিয়াতে তারা একে অপরে যাদের উপর জুলুম করেছিলো সেটার প্রতিদান ও শোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। এভাবে যখন তারা সকল দেনা-পাওনা ও দাবীদারদের থেকে মুক্ত হবে ও পবিত্র হবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়াতে তার বাসস্থানকে যেভাবে চিনে, জান্নাতে তার বাসস্থানকে তার চাইতেও উত্তম ও ভালো ভাবে চিনবে।” (বুখারী শরীফ, হাদিস ৬০৮১)

পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলে আপনি জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন আর আমরা ইতিপূর্বে জান্নাতের দরজাগুলো কেমন হবে, প্রশস্ততা কেমন হবে, কে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, কিভাবে প্রবেশের সময় তাদেরকে ফেরেশতাগণ সাদর সম্ভাষণ জানাবেন এগুলো আলোচনা করেছি।

বুখারী শরীফের এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে যেভাবে তোমরা তোমাদের ঠিকানা চিনতে, সেখানে তার

চাইতেও ভালো করে তোমাদের বাসস্থান চিনবে। জান্নাতে আপনার ঠিকানা খুঁজে পেতে আপনার কোন ভ্রমণসহযোগীও দরকার হবে না; কোন নির্দেশনারও প্রয়োজন পড়বে না; আপনার কোন বন্ধুকেও ফোন করে আপনার বাসস্থান সম্পর্কে জানতে হবে না।

স্বাভাবিকভাবেই আপনি জানতে পারবেন কোথায় অবস্থান করবেন। কারণ আপনি হলেন একজন আদম সন্তান। আর আদম আ. এর বাসস্থান, আদি বাড়ি ছিল জান্নাত। আদম আ. পৃথিবীতে কোন দেশ বা জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; তার কোন জাতীয়তা ছিল না। আদম আ. এর এ নিয়ে কোন অহংকার ছিল না যে, তিনি এ পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট, ‘আমি এই দেশের নাগরিক, আমার দেশ শ্রেষ্ঠ দেশ’ ইত্যাদি কিছু ছিল না। তিনি একজন বিশ্ব নাগরিক, কাজেই আমরা আদম সন্তান আমরাও এই সারা বিশ্বের নাগরিক, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনৈতিক কারণে আমরা নিজেদের বিভিন্ন কৃত্রিম জাতি আর নাগরিকত্বে বিভক্ত করে নিয়েছি।

কাজেই আদম কখনো নাগরিকত্ব বা সিটিজেনশীপ নিয়ে অহংকার করেন নি। তিনি ঐরূপ অহংকার কখনই করতেন না, কেননা তাঁর আসল বাসস্থান হচ্ছে জান্নাত। দুনিয়াতে আসা, অবস্থান করা ছিল আদমের জন্য শাস্তি! অথচ আমরা দুনিয়াকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি!

কাজেই আদম জান্নাতে ফিরে যাবেন, তিনি জান্নাতের নাগরিক, আর তার সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল নেককার, তাদের বাসস্থানও জান্নাত। তাই এ পৃথিবী ছিলো তাঁদের জন্য একটি ক্ষণস্থায়ী জায়গা।

তারা ছিলেন মুসাফির, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

بمنكبي ، فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘাড়ের হাত রেখে বললেন, “তুমি পৃথিবীতে একজন মুসাফির ও অপরিচিতের মতোই থাকো।”

আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, আপনি এখানকার অস্থায়ী বাসিন্দা। কাজেই এই পৃথিবীর কোথায় কি আছে, তার সবকিছু জানা আপনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু হ্যাঁ, আপনি আপনার দুনিয়ার ঠিকানা সম্পর্কে জানেন অথচ এটা আপনার জন্য একটি অস্থায়ী জায়গা। মূলত আপনি জান্নাতের বাসিন্দা এবং পৃথিবীতে আপনার বাড়ির পথঘাট ঠিকানা জানার চেয়েও সহজভাবে জান্নাতে আপনার ঠিকানা আপনি চিনতে পারবেন। সহজাতভাবে, ফিতরাতগতভাবেই আপনার অন্তর সেখানে আপনাকে নির্দেশনা দিবে, কারো কাছ থেকে পথ দেখে নিতে হবে না, কারো ফোন নাম্বার লাগবে না। আপনি নিজেই আপনার প্রাসাদে পৌঁছে যাবেন।

এবার আপনি যখন সেতু পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, আপনার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। আপনি হাশরের ময়দানে, শেষ বিচারের দিনে বহু বছর ধরে অপেক্ষা করছেন; বছরের পর বছর, ৫০,০০০ বছর ধরে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে কষ্ট করেছেন, কোন খাদ্য ছিল না, পান করার কিছু ছিল না; প্রচন্ড গরম। তাই আপনি এখন খুবই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত। যেই মাত্র আপনি জান্নাতের দরজা খোলা পেলেন এর ভেতর ঢুকে পড়লেন। এবার আপনার আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

তাহলে আসুন জেনে নিই জান্নাতে আপনার প্রথম খাবার আর পানীয় কি হবে। আপনি ভোজ শুরু করবেন হালকা খাবার দিয়ে, শুরুতে এপেটাইজার, হালকা খেয়ে ক্ষুধাটা একটু চাঙ্গা করে নিন, এরপর যাবেন মূল খাবারে। এরপর আসবে এক ধরনের পানীয়। আর স্মরণ করুন আপনি খুব ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত তাই এটা হবে আপনার জীবনে খাওয়া সবচেয়ে মজাদার খাবার। উপরন্তু এটা জান্নাতের খাবার, সুতরাং সহজেই বুঝতে পারছেন এই খাবার কত মজার ও সুস্বাদু হবে।

প্রথমে হালকা খাবারটা হবে মাছের কলিজা। এক্ষেত্রে কারো হয়তো মনে হতে পারে যে আসলে এটা কেমন হবে? আমি জানি না দুনিয়ার খাবারগুলোর মধ্যে মাছ আপনাদের প্রিয় কি না, তার ওপরে আবার এটা মাছের কলিজা? কিন্তু এটা মনে রাখবেন এটা জান্নাত, এখানে যা কিছুই খেতে দেয়া হবে তা হবে অসাধারণ ও সর্বোত্তম। তাই রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাছের কলিজা সম্পর্কে বলেছেন, ‘যিয়াদাহ’ অতিরিক্ত বা বর্ধিত অংশ, তিমি মাছের কলিজা। কাজেই আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পারেন যে, এটা সত্যি খুব মজার হবে।

আর এটা ছিলো হালকা খাবার। এরপরই আসবে মূল খাবার। হাদীসে বলা হয়েছে, সেটা হবে একটি ষাঁড় বা অল্প বয়সী জন্তু বা বাছুর। সেই ষাড়টি এখন কোথায় আছে? এখন সে জন্তু জান্নাতে রয়েছে এবং জান্নাতের ঘাস খাচ্ছে। এখন সে জান্নাতে মনের আনন্দে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। আপনাকে খাওয়ানোর জন্য সে নিজেকে খাওয়াচ্ছে, এটা মোটা তাজা হচ্ছে। আর জান্নাতে এটাকে খাওয়া হবে, রানের গোশত থেকে। আর যখন আপনি জান্নাতে এই অল্প বয়সের ষাঁড় বা বাছুরের রানের গোশত দিয়ে আহার করবেন তখন সেটা যে কতো মজার আর আনন্দের হবে তা একবার কল্পনা করুন!

আর নবীগণের একটি ঐতিহ্য হিসেবে, যখনই তাঁরা কোন অতিথি পেতেন যদি তাঁদের যবেহ করার মতো কোন প্রাণী থাকত তাঁরা তাঁদের অতিথিদের সম্মানে তা যবেহ দিতেন। হযরত ইবরাহীম আ. এর মতো যেমনটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কাছে তিনজন অতিথি এসেছিলেন। তিনি তাঁদের সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন? তিনি তাঁদের জন্য একটি বাছুর জবাই দিয়েছিলেন এবং রোস্ট করে গোশত খাইয়েছিলেন। সেই বাছুর সম্পর্কে যেমনটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ

أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾

অর্থ: “আর অবশ্যই আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আসলো। তাঁরা বললো, ‘সালাম’। সেও বললো, ‘সালাম’। এরপর বিলম্ব না করে ইবরাহীম আ. একটি ভূনা গো-বাছুর নিয়ে আসলেন।” (সূরা হুদ, আয়াত ৬৯)

এই আয়াতে বলা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম আ. একটি ভুনা করা عَجَلِ বাছুর নিয়ে এলেন!

এবং خَبِيزٌ এটা রোস্ট করা। সুতরাং এটা হলো সেই খাবার যা সাইয়্যিদিনা ইবরাহীম আ. তাঁর অতিথিদেরকে খাইয়েছিলেন। তাই যখন আপনার বাড়িতে কোনো মেহমান আসেন এবং আপনি যখন তাদের জন্য কিছু একটা জবাই করেন, তখন সেটা হয়ে থাকে আপনার অতিথিদের সম্মান জানানোর একটি নমুনা।

সুতরাং যখন আপনারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন আর জান্নাতে আপনারা প্রথম মেহমান হিসেবে এসেছেন; তখন আপনাদের জন্য ফেরেশতারা এই বিশেষ খাবার পরিবেশন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই এই বাছুর যেটা আপনাদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে জান্নাতে চড়ানো হয়েছে, সেটা খাওয়ানো হবে, তা যবাই করা হবে এবং আপনারা এর গোশত প্রথম খাবার হিসেবে মজা করে খাবেন।

জান্নাতে আপনার পানীয়

জান্নাতের পানীয় হবে এক বিশেষ উপাদান। প্রথম খাবারের সাথে আপনারা যা পান করবেন তা হবে ক্লাস্তি-অবসাদ দূরকারী এক ঝর্ণা থেকে আসা সুপেয় পানীয়, যার নাম সালসাবিল। এই ঝর্ণার পানিই আপনারা খাবারের সাথে পান করবেন। সালসাবিল কীরূপ এ ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা নেই?

নাম শুনে যতোটা ভালো মনে হচ্ছে, এর স্বাদ হবে তার চাইতেও অনেক অনেক বেশি চমৎকার। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, أَنْ تَوَيَّانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ خَبْرٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ. فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي ". فَقَالَ الْيَهُودِيُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيْنَفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ ". قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِي فَتَنَكْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ. فَقَالَ " سَلْ ". فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ " قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَارَةٌ قَالَ " أَتَمْرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ". قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُخَفُّهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ " زِيَادَةُ كَبِدِ الثَّوْنِ " قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ " يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا ". قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ " مِنْ عَيْنٍ فِيهَا سَمَى سَلْسِيلًا ". قَالَ صَدَقْتُ.

অর্থ: “ছাওবান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুক্ত করা দাস বলেছেন, যখন আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন একজন ইহুদি পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আসসালামু আলাইকুম ইয়া মুহাম্মাদ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুহাম্মাদ!

এ কথা শুনে, আমি তাকে সজোরে ধাক্কা দিলাম, যার ফলে সে প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তখন ইহুদি পণ্ডিত জিজ্ঞেস করল, তুমি আমাকে কেন ধাক্কা দিলে? আমি বললাম, তুমি কেন আল্লাহর রাসূল বলে সম্বোধন কর নি?

এই ইহুদি আবেদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু মোহাম্মদ বলেছে আল্লাহর রাসূল বলে নি, তাই ছাওবান রাগিত। রাগন্বিত হয়ে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। তখন ইহুদি পণ্ডিত বলল, আমরা তাকে তার পরিবার যে নাম দিয়েছিল সেই নামেই ডাকি। তার পরিবার তাকে মোহাম্মদ নাম দিয়েছে, তাই আমি তাকে মোহাম্মদ বলে ডেকেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার ভদ্রতা ও দয়ার খাতিরে বললেন, হ্যাঁ আমার পরিবার আমাকে মোহাম্মদ নাম দিয়েছে, আমার নাম মোহাম্মদ, তুমি আমাকে মোহাম্মদ ডাকতে পার।

তারপর ইহুদি বলল, আমি আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আমি তোমাকে এসকল প্রশ্নের উত্তর দেই তাহলে এগুলো কি তোমার কোনো উপকারে আসবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই লোকটি উনার সাথে বিতর্ক করতে এসেছে, তাই উনি জিজ্ঞেস করলেন, যদি আমি তোমাকে উত্তর দেই, এগুলো কি তোমার কোন উপকারে আসবে? তখন ইহুদি বলল, আমি নিশ্চিত না যে আমার উপকারে আসবে কি না, কিন্তু আমি গুরুত্ব সহকারে উত্তরগুলো শুনবো।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে একটি লাঠি ধরা ছিল এবং এটা বালির দিকে তাক করা ছিল, সে অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে বল, প্রশ্ন করো। তখন ইহুদি পণ্ডিত বললো, যখন পৃথিবী ও আসমান পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন মানুষ কোথায় থাকবে?

সে বিচার দিবসকে উদ্দেশ্য করে এ প্রশ্ন করেছিল, যে ওইদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মানুষ ব্রিজের পাশে অঙ্ককারে থাকবে, সিরাতুল মুস্তাকিমের (পুলসিরাত হতে পারে) পাশে থাকবে।

ইহুদিটি জিজ্ঞেস করল, মানুষের মধ্যে কে সর্বপ্রথম এই ব্রিজকে পাড়ি দিবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ‘ফুকারাউল মুহাজিরীন’ -গরীব মুহাজিরীনগণ। আমরা এ ব্যাপারে আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এরপর ইহুদিটি বলল, তাঁরা সর্বপ্রথম কি দিয়ে নাস্তা করবে?

যদিও নাস্তা বা হালকা খাবার বলে অনুদিত হয়েছে মূল আরবী হচ্ছে তোহফাত, যা আসলে ক্ষুধা বাড়ানোর জন্য খাওয়া হয় এমন কিছু বুঝায়। অর্থাৎ ইহুদী লোকটি জিজ্ঞেস করছিল, তাদের প্রথম খাবার কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাছের কলিজা।

ইহুদি জিজ্ঞেস করলো, এরপর তাঁদের খাবার কি হবে?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জান্নাতের বিভিন্ন বাগানে চড়ানো একটি ঝাঁড় তাদের জন্য জবাই করা হবে।

এই ঝাঁড়গুলো জান্নাতের বিভিন্ন স্থান থেকে ঘাস লতা খেয়ে বড় হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এই খাবার কত মজাদার হবে!!

ইহুদিটি জিজ্ঞেস করল, তাঁদের সুপেয় পানীয় কি হবে?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে একটি ঝর্ণা থেকে পান করার জন্য পানীয় দেয়া হবে। যার নাম সালসাবিল।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২২৪০)

আমরা আগেই বলেছি, আপনাদেরকে কল্পনা করতে যে, আপনারা জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। আমরা ভারুয়াল ভ্রমণে আছি, সুতরাং আপনি জান্নাতে প্রবেশের পর আপনাকে আপ্যায়ন করা হলো। আপনি জান্নাতের প্রথম খাবার এবং প্রথম পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছেন, এবারে আমরা আপনার স্থায়ী সম্পত্তিগুলো ঘুরে দেখবো, আপনার স্থাবর সম্পত্তিসমূহ।

আপনার সহজাত প্রবৃত্তিই আপনাকে জান্নাতের বিভিন্ন পথে আপনার স্থায়ী আবাস ও সম্পত্তির দিকে নিয়ে যাবে। এ পথে যেতে যেতে চারপাশের বিস্ময়কর সৌন্দর্য আমাদের অভিভূত করলো, শ্বাসরুদ্ধকর আশ্চর্য রকমের সব দৃশ্য! এবং এগুলো দেখতে দেখতে আপনিও অভিভূত! পথ চলতে চলতে এই অস্বাভাবিক সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আপনি এখন চলে এসেছেন একটি সুন্দর রাজপ্রসাদের সামনে, স্থাপত্যশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন! যা দেখে আপনি আগের চেয়েও মুগ্ধ! এবং আপনাকে বলা হবে এসবগুলোই আপনার!

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

অর্থ: “যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাঁদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দিবো, যার তলদেশ দিয়ে প্রসবণসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কারই না পাবে সৎকর্মশীলগণ।” (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৫৮)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আপনি যে রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে এবং জান্নাতের যা যা ঘুরে দেখছেন এর সবই হচ্ছে আপনি জান্নাতের যে লেভেল বা স্তরে আছেন, সেই স্তরের নিয়ামতসমূহ। কাজেই আমরা জান্নাতে আমাদের স্তরের দিকে পরিচালিত হবো, কারণ আমরা জানি যে জান্নাতের অনেকগুলো স্তর আছে। জান্নাত বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা, শুধু একটা স্তরে নয়। যেখানে সবাই সমান এমনও নয় -জান্নাতের অনেকগুলো স্তর আছে, আল্লাহ বলছেন,

﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾

অর্থ: “দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরের ওপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম।” (সূরা ইসরা, আয়াত ২১)

আল্লাহ এখানে বলছেন যে, আমরা মানুষদের মধ্যে এমনভাবে নিয়ামত বন্টন করেছি যাতে তারা বিভিন্ন নিয়ামতের দিক থেকে বিভিন্ন অবস্থানে আছে, সম্পদের দিক থেকেও ভিন্ন, কেউ গরীব কেউ ধনী, কেউ স্বাস্থ্যবান কেউ স্বাস্থ্যহীন, কেউ সবল, কেউ দুর্বল, কেউ সাদা বর্ণের, কেউ কালো। আল্লাহ রিযিককে মানুষের মাঝে বিভিন্নভাবে বন্টন করেছেন এবং এ দুনিয়ার মানুষজনও বিভিন্ন স্তরে বসবাস করে। কিছু মানুষ অন্যের কাজ করে, আবার কিছু মানুষের কাজ অন্যরা করে দেয়। আল্লাহ এ দুনিয়ার বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নিয়ামত বিভিন্ন পরিমাণে বন্টন করেছেন, আল্লাহ

বলেছেন, যেভাবে এ দুনিয়ায় মানুষের মাঝে ভিন্নতা আছে, তেমনিভাবে জান্নাতের লোকদের মধ্যেও বড় ধরনের ভিন্নতা থাকবে। এ দুনিয়ায় লোকজনের মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদের পার্থক্য, এটাকেই আমরা কত বড় করে দেখি!

মাঝে মাঝে আমরা বলি যে কিছু লোকের কিছুই নেই, আবার কিছু লোকের সবই আছে। কিন্তু জান্নাতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য আরও আরও অনেক বেশি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদীসে বলেছেন যে, নিচের স্তরের জান্নাতবাসীগণ ওপরের স্তরের জান্নাতীদেরকে এমনভাবে দেখবে যেভাবে আমরা আকাশের তারকা দেখি, এটাই হচ্ছে জান্নাতের স্তরের মধ্যে পার্থক্য, কেননা জান্নাত হচ্ছে বিশাল।

আমরা এই দুনিয়ার স্তরভেদের কারণে এই সীমিত সম্পদ এর জন্যও জীবন দিয়ে যুদ্ধ করছি, একে অপরকে হত্যা করছি, ছোট্ট একটা স্থানে, যেখানে সবকিছু সীমিত। অথচ জান্নাতের এই স্তরভেদ হবে আরও বিশাল, কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার দিকে আমরা উদাসীন, জান্নাতের উঁচু উঁচু মর্যাদাপূর্ণ স্থানগুলোতে আমাদের আসন পাকা করে নেয়ার জন্যই তো উচিত প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতা করা, এটা আসল প্রতিযোগিতা, একারণেই আমরা দেখতে পাই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

অর্থ: “আর তোমরা দ্রুত গতিতে দৌড়ে আসো মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সেই সুবিশাল জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান এবং যমীনের, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৩)

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা এখানে বলছেন, জান্নাতের প্রশস্ততার কথা, শুধু প্রশস্ততা, দৈর্ঘ্য নয়, প্রশস্ততাই হবে আসমান আর যমীনের সমান, তাহলে এর আকার কত বিশাল হবে! সুবাহানাল্লাহ!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ৭টি আসমান সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

অর্থ: “মহান আল্লাহ হলেন সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞানতো সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।” (সূরা ত্বলাক, আয়াত ১২)

এছাড়াও সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াত, সূরা ফুসসিলাত এর ১২ নং আয়াত, সূরায়ে মুলক এর ২ নং আয়াত এবং সূরায়ে নূহ এর ১৫ নং আয়াতে যা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর এই সাত আসমানের মধ্যে আমরা সর্বনিম্ন স্তরের আসমানে বসবাস করছি। এটা হচ্ছে দুনিয়ার স্তরের আসমান, ‘সামাউদ দুনিয়া’। এই আসমান এর ওপরের আসমানের তুলনায় বিশাল মরুভূমির মাঝে একটি আঙুরের মতো ক্ষুদ্র।

এবং আমরা যে আসমানে বসবাস করি সেটা কত বড় তা কি আপনারা জানেন? প্রত্যেক তারকা যাদেরকে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক সৌরজগত, গ্যালাক্সী, আমরা যাদের সম্পর্কে জানি, প্রত্যেকটিই সর্বনিম্ন আসমানের মধ্যেই আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾

অর্থ: “আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি।” (সূরা মুলক ৬৭, আয়াত ৫)

সুতরাং আমরা যে সকল নক্ষত্র সম্পর্কে জানি সেগুলো সবই সর্বনিম্ন স্তরের আসমানে আছে এবং আমরা এই সর্বনিম্ন স্তরের আসমানের বিশালতা বুঝতে গিয়ে দূরত্ব হিসাব করি, মহাকাশবিদ্যার দূরত্বের মাধ্যমে। আমরা সাধারণ মাইল বা কিলোমিটারের একক ব্যবহার করছি না। কারণ

আপনারা জানেন জ্যোতির্বিদ্যায় দূরত্ব মাইল বা কিলোমিটার ব্যবহার করে নির্ণয় করা হয় না, আলোকবর্ষ ব্যবহার করে করা হয়।

কারণ, মহাকাশের দূরত্বের ক্ষেত্রে এর বিশালতা এতো বেশি যে, এক্ষেত্রে মাইল এককে কিংবা কিলোমিটার এককে দূরত্ব হিসাব করাটা অর্থহীন, কেননা প্রতিটি এককের পরে আমাদেরকে অনেকগুলো শূন্য বসাতে হবে, কাজেই এটা হিসাবের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। বিশাল বড় সংখ্যা আসবে। তাই এ দূরত্ব আলোকবর্ষ এককে মাপা হয়। আলো এক বছরে যতটুকু পথ পাড়ি দেয়, যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হল এই মহাকাশ বিদ্যার দূরত্ব মাপার একক।

উদাহরণস্বরূপ: আলোকবর্ষের এককে সূর্য আমাদের কত কাছে? সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে? আট মিনিটের কাছাকাছি। আর সূর্য বাদে সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকাটি আমাদের কত কাছে? সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকাটি আমাদের থেকে প্রায় সোয়া চার আলোকবর্ষ দূরে। অর্থাৎ আলো ওই তারকা থেকে আমাদের কাছে আসতে সোয়া চার বছর সময় নেয়!

আপনারা জানেন, আলোর গতি বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩০০ হাজার কিলোমিটার, অর্থাৎ আলো প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩০০ হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করে, প্রতি সেকেন্ডে! এরপরও আলো ওই নিকটবর্তী তারকা থেকে আমাদের কাছে আসতে সোয়া চার বছর সময় নেয় এবং এমন বহু নক্ষত্রও আছে যারা পৃথিবী থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, তাদের কাছ থেকে আলো আমাদের কাছে আসতে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর সময় লাগে এবং এর সবই হচ্ছে আস সামা আদ দুনিয়া বা সর্বনিম্ন আসমানে, আর এতো কিছু নিয়ে এই সর্বনিম্ন আসমান এর ঠিক ওপরের আসমানের তুলনায় মরুভূমির মাঝে একটি আঙুরের মতো!

২য় আসমান তার পরবর্তী আসমানের তুলনায়, মরুভূমির মাঝে আঙুরের মতো। ৩য় আসমান ৪র্থ আসমানের তুলনায় মরুভূমির মাঝখানে আঙুরের

মতো, এভাবেই সপ্তম আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত। আর ৭ম আসমান আল্লাহর কুরসি এর তুলনায় মরুভূমির মাঝখানে আংটি স্বরূপ। আর আল্লাহর কুরসি, আল্লাহর আরশের তুলনায় বিশাল মরুভূমির মাঝখানে ছোট্ট একটি আংটির মতন।

এবং আল্লাহ (সুব) বলছেন, জান্নাতের বিশালতা সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে, ‘জান্নাতের প্রশস্ততা সমস্ত আসমান ও জমিনের সমান’।

তাহলে জান্নাতের বিশালতার সাথে এই দুনিয়া কত ক্ষুদ্র সেই তুলনা আমরা না হয় নাই করলাম, শুধু প্রথম আসমানের সাথে তুলনা করলেই আমরা দেখতে পাই, এই পৃথিবী যা নিয়ে মানুষের মধ্যে এত মারামারি হানাহানি, যুদ্ধ, সম্পদ দখলের জন্য লড়াই, অথচ এই দুনিয়া কত সামান্য! কত ক্ষুদ্র, একটি বিন্দু সমপরিমাণও নয়!

অথচ আল্লাহ (সুব) জান্নাতে মুমিনদের জন্য যে উপহার প্রস্তুত করে রেখেছেন তার তুলনায় এগুলো কিছুই না।

সুতরাং এখানে জান্নাতের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আমরা বিশাল ব্যবধান দেখতে পাই। আর আল্লাহ (সুব) শক্তিশালী মুমিনদেরকে দুর্বল মুমিনদের তুলনায় বেশি দিবেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ.

অর্থ: “একজন শক্তিশালী মুমিন, দুর্বল মুমিনের তুলনায় ভালো এবং আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, যদিও এদের দু’জনের মধ্যেই কল্যাণ ও খায়র আছে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৬৪)

সুতরাং উভয়ের মধ্যেই খায়র আছে, কল্যাণ আছে। শক্তিশালী মুমিনও ভালো, দুর্বল ঈমানদারও ভাল। কিন্তু শক্তিশালী ঈমানদাররা দুর্বল ঈমানদারদের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয় এবং স্বাভাবিকভাবে এটাই প্রত্যাশিত যে, আল্লাহ (সুব) শক্তিশালী মুমিনদেরকে অধিক পরিমাণে দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের তারতম্যের কারণে জান্নাতের এক স্তরের অধিবাসী তাঁর ওপরের স্তরের অধিবাসীদেরকে এমনভাবে দেখবে, যেভাবে তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের উজ্জ্বল তারকাকে দেখ।” (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০৮৩)

নিম্নস্তরের অধিবাসীরা ওপরের স্তরের অধিবাসীদেরকে তারকার মতো দেখবে যা তাদের থেকে অনেক দূরে। কারণ দুনিয়াতে তাদের কাজের মধ্যেও ব্যবধান ছিল। তাই দুনিয়াতে একটি ছোট্ট প্রচেষ্টা আখিরাতে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি করবে। দুনিয়ার সামান্য একটা ভালো কাজের জন্য আপনি দেখবেন যে, আখিরাতে অনেক বড় পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। তাই ছোট একটা ভালো কাজ পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্বের মতো ব্যবধান তৈরি করতে পারে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সাহিবুল কুরআন বা কুরআনের সংরক্ষককে বলা হবে তুমি

কুরআন পড়তে থাকো এবং এক এক করে ওপরের দিকে উঠতে থাকো এবং তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকো, যেমন দুনিয়াতে পাঠ করতে। তোমার চূড়ান্ত অবস্থান হবে সেই উচ্চস্তরে কুরআন পড়তে পড়তে শেষ আয়াতে যেখানে গিয়ে তুমি থামবে।” (তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৩৮)

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি দুনিয়াতে কুরআন মুখস্থ করবে, পড়বে ও আমলের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করবে, তারা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বলা হবে, প্রত্যেক আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথে জান্নাতে তাদের অবস্থান একস্তর করে বেড়ে যাবে। তাই একটিমাত্র আয়াত দুই স্তরের মধ্যবর্তী ব্যবধান তৈরি করবে!

একটিমাত্র আয়াত মুখস্থ করতে কতটুকু সময় লাগে? অল্প একটু সময়, কিছু মিনিট। তাই দুনিয়ার খুব ছোট একটি কাজ আখিরাতে বিশাল রূপ ধারণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনারা পদার্থ বিজ্ঞানে লিভার সম্পর্কে জানেন, যে যন্ত্রে একটি সামান্য পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হলে অপর পাশে এই বল বিবর্ধিত হয়ে বিশাল আকার ধারণ করে এবং ভারী বস্তু উত্তোলনে সাহায্য করে। পদার্থবিজ্ঞানে আপনারা এই সম্পর্কে ভালো ধারণা পাবেন। আখিরাতেও বিষয়টা এরকম হবে, দুনিয়ার সামান্য ভালো কাজের কারণে আখিরাতে বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

আল্লাহ (সুব) কুরআনে বলেছেন যে, জান্নাতে এরকম পার্থক্য থাকবে। আল্লাহ (সুব) সূরা আর রহমানে দু’টি গ্রুপ সম্পর্কে বলেছেন। যাদের মধ্যে একটি হচ্ছে-

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾

অর্থ: “যে ব্যক্তি তাঁর পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে, তাঁর জন্য রয়েছে দু’টি উদ্যান।” (সূরা আর রহমান, আয়াত ৪৬)
এরপর আল্লাহ এই দু’টি বাগানের বর্ণনা দিয়েছেন,

তারপর আল্লাহ (সুব) ভিন্ন স্তরের জান্নাত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন,

﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾

অর্থ: “এই দু’টি ছাড়া আরও দু’টি উদ্যান রয়েছে।” (সূরা রাহমান, আয়াত ৬২)

তাই জান্নাতে উচ্চস্তর ও তাদের নিচে নিম্নস্তর থাকবে।

তো কোনটি সবচেয়ে উচ্চস্তর? আর কোনটি সবচেয়ে নিম্নস্তর?

প্রথমেই আমরা জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নস্তর সম্পর্কে আলোচনা করবো। হযরত মুসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘ও আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ও সর্বনিম্ন স্তর সম্পর্কে বলুন।’

জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরের পার্থক্য নিয়ে বিভিন্ন সনদের বিভিন্ন হাদীস আছে, এ সবগুলোই সহীহ হাদীস।

যার মধ্যে একটি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, সর্বশেষ ব্যক্তি, (শুধু আল্লাহই জানেন তাকে কত বছর জাহান্নামের আজাব সহ্য করতে হবে), এই ব্যক্তিকে যখন জাহান্নাম থেকে বের করা হবে তাঁর আগেই জান্নাতের সকল অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করেছে এবং তারা বছরের পর বছর জান্নাতে কাটিয়ে ফেলেছে, হতে পারে হাজার হাজার বছর বা মিলিয়ন মিলিয়ন বছর। এর পরিমাণ শুধুমাত্র আল্লাহ (সুব)ই জানেন।

অতএব জান্নাতিরা যখন অনেক সময় ধরে জান্নাতে থাকবে তখন এই ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে। সে কোন রকমে জাহান্নাম থেকে বের হয়েছে, তার এত বেশি পাপ ছিলো যে সে জাহান্নামে অনেক দীর্ঘ সময় যাবৎ ছিলো। একেবারে শেষে আল্লাহ (সুব) তাকে জাহান্নাম ত্যাগ করার অনুমতি দিবেন, এই ব্যক্তিটি জাহান্নামে অনেক দিন আযাব ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে এবং সে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। সে এখনও জান্নাতে

প্রবেশ করে নি। সে জাহান্নাম থেকে বের হওয়াতেই অনেক খুশি, যদিও সে জান্নাত বা জাহান্নাম কোথাও নেই। তারপরও সে অনেক খুশি। কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ, তাই আমরা লোভী। আমরা সব সময়ই যা আছে তার চেয়ে বেশি চাই। তারপর এই ব্যক্তিকে দূর দিগন্তে আল্লাহ (সুব) একটি গাছ দেখাবেন। এই ব্যক্তিটি যে স্থানে ছিল ওই স্থানটা পতিত ভূমি যেখানে কিছুই জন্মায় না। স্থানটা জাহান্নামের খুবই কাছাকাছি তাই জাহান্নামের তাপ এই ভূমিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, যদিও এটা জাহান্নামের কোন অংশ নয়। আল্লাহ (সুব) এ স্থান থেকে কিছু দূরে একটি গাছ দেখাবেন।

যদিও এই লোকটি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের স্থানে ভালোই ছিল, তারপরও এই গাছ দেখে সে আল্লাহ (সুব) কে বলবে ‘ও আল্লাহ আপনি কি আমাকে দয়া করে ওই গাছের নিচে যেতে দিবেন? যাতে আমি এ গাছের ছায়ায় থাকতে পারি, আর এর থেকে ফল খেতে পারি, আর এ গাছকে যে পানি দিয়ে সঁচ দেয়া হয়েছে ওই পানি পান করতে পারি। তখন আল্লাহ (সুব) তাকে গাছের নিচে যাবার অনুমতি দিবেন।

তারপর আল্লাহ (সুব) তাকে আরেকটি গাছ দ্বারা প্রলুব্ধ করবেন, যা এর চেয়েও বড় এবং দেখতেও অনেক সুন্দর। এই গাছ দেখেও ব্যক্তিটি আল্লাহকে বলবে, ‘ও আল্লাহ আপনি কি দয়া করে আমাকে এই গাছের নিচে যেতে দিবেন?’

তখন আল্লাহ (সুব) বলবেন ‘ও আদম সন্তান কি তোমাকে সন্তুষ্ট করবে? যদি আমি তোমাকে কিছু দেই তাহলে তুমি তার চেয়েও বেশি চাও। ব্যক্তিটি বলবে, ও আল্লাহ আমি আর কিছুই চাই না, ওই গাছই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আপনাকে আর কোন কিছুর জন্যই বলবো না।

তখন আল্লাহ (সুব) তাকে ঐখানে যাবার অনুমতি দিবেন এবং লোকটি ওই গাছের নিচে যাবে। এরপর লোকটি আরও বড় একটা গাছ দেখতে পাবে, যখনই সে এরকম গাছ দেখতে পাবে তখনই সে বলবে, ‘ও আল্লাহ দয়া করে আমাকে ওই গাছের নিচে যেতে দিন?’

তখন আল্লাহ (সুব) বলবেন, “তুমি কি আমাকে বলো নি যে, তুমি আর কিছু চাইবে না? ও আদম সন্তান তুমি কিসে সন্তুষ্ট হবে? ব্যক্তিটি বলবে ও আল্লাহ, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আর কিছুই চাইবো না। শুধু ওই গাছটার নিচে একটু যেতে চাই।

আল্লাহ (সুব) তাকে ওই গাছের নিচে যাবার অনুমতি দিবেন। ধীরে ধীরে গাছ আরও বড় ও সুন্দর হচ্ছে, কারণ আমরা ধীরে ধীরে জান্নাতের দিকে যাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এর কারণ হচ্ছে, জাহান্নাম পরিবেশের জন্য দুর্ভোগের মতো, আমরা আগেই বলেছি, যদি এক ফোঁটা যাক্কুম পৃথিবীতে পড়ে তাহলে পৃথিবীতে মহামারী ঘটবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزُّقُومِ قُطِرَتْ فِي بَحَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “...যদি যাক্কুমের এক ফোঁটা এই পৃথিবীতে পড়ে তাহলে এই ফোঁটা পৃথিবীর সকল কিছুকেই বিষাক্ত করে ফেলবে, এর অধিবাসীদের জীবন দুর্বিসহ করে দিবে। তাহলে কেমন হবে তাদের অবস্থা যাদের পানাহার হবে এই যাক্কুম?” (মুসাদে আহমাদ)
তাই বলা যায় জাহান্নামের কাছাকাছি এই পতিত জমি জাহান্নামের কারণে একেবারেই অনুর্বর। কিন্তু এখন আমরা জান্নাতের কাছাকাছি যাচ্ছি, তাই গাছও বড় এবং সুন্দর হচ্ছে।

তো যখন লোকটি আরও বড় গাছের নিচে যাবে, সে কি দেখতে পাবে? সে তার চোখের সামনে জান্নাতের দরজা দেখতে পাবে। কিছু দূরেই সে জান্নাতের গেট দেখতে পাবে। এখন কোনভাবেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। সে বলবে ‘ও আল্লাহ যদিও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তারপরও দয়া করে আমাকে জান্নাতের দেয়ালের নিচে একটু বসার অনুমতি দাও।

আমি জান্নাতে যেতে চাই না আমি শুধু জান্নাতের দরজার কাছাকাছি থাকতে চাই।

তখন আল্লাহ (সুব) বলবেন, ও আদম সন্তান তুমি বার বার আমার কাছে চাচ্ছে আর প্রতিজ্ঞা করছো যে, তুমি আর কিছু চাইবে না, আর আমি বার বার তোমাকে দিয়েই যাচ্ছি, তুমি কি আর কিছু চাও?

লোকটি বলবে ও আল্লাহ আমি আর কিছু চাই না, এটাই আমার শেষ চাওয়া। আমাকে শুধু জান্নাতের দরজার নিচে থাকতে দাও। এখন লোকটি জান্নাতের দেয়ালের নিচে থাকতে যাবে। যখন সে সেখানে যাবে তখন সে জান্নাতের লোকদের কথার আওয়াজ শুনতে পাবে, সে জান্নাতিদের হাসি, কথাবার্তা শুনবে এবং সে মনে মনে হিংসা অনুভব করবে। সে জান্নাতের আনন্দের এ শব্দ শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারবে না, তখন সে বলবে, ও আল্লাহ আমাকে শুধু গেটের ভিতরে ঢুকতে দাও।

আল্লাহ (সুব) বলবেন, হে আদম সন্তান, তোমাকে কিসে আনন্দ দিবে? যদি আমি তোমাকে সম্পূর্ণ পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা আছে সব সম্পদ দেই তাহলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?

এই লোকটি প্রত্যেকবারই আরও বেশি আরো বেশি চাচ্ছে। তাই আল্লাহ (সুব) বলছেন, আমি যদি তোমাকে এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা আছে সম্পূর্ণ তোমাকে জান্নাতের মধ্যে দেই তাহলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?

সে বলবে ও আল্লাহ হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট হবো। তখন আল্লাহ (সুব) বলবেন, আমি তোমাকে এটা দিবো, এরকম আরেকটা দিব, এরকম আরেকটা দিব, এরকম আরেকটা দিব, আল্লাহ একে বার বার গুণ করবেন যতক্ষণ না আল্লাহ (সুব) পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা আছে তাকে ৫ বার গুণ করবেন। লোকটি আল্লাহ (সুব) কে বলবে, ও আল্লাহ! ও আল্লাহ! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, আমি সন্তুষ্ট, আমি সন্তুষ্ট।

আল্লাহ (সুব) বলতেই থাকবেন, আর লোকটি বলতে থাকবে ও আল্লাহ এতোটুকুই আমার জন্য যথেষ্ট, ও আল্লাহ এতোটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ (সুব) বলবেন, আমি একে আরও ১০ গুণ করবো, তারপর এর বাইরেও আমি তোমাকে দিবো যা তোমার চোখকে আনন্দিত করবে আর তোমার মনকে সন্তুষ্ট করবে।

(এটাই হচ্ছে জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তর) পৃথিবী ও এর মধ্যে যা আছে তার ১০ গুণ এবং এরপর তোমার জন্য এর বাইরেও চাওয়ার দরজা উন্মুক্ত করা হবে তুমি যা চাও চাইতে পারবে এবং আমি তোমাকে তাই দিবো যা তোমার চোখকে আনন্দিত করবে মনকে সন্তুষ্ট করবে।

এটাই হচ্ছে জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তর, যা এমন একজন মানুষের জন্য, যে পাপ করেছে, জাহান্নামে বছরের পর বছর আযাব ভোগ করেছে, আল্লাহ (সুব) তাকে পুরো পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা আছে তার ১০ গুণ দিবেন। এটাই হচ্ছে জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তর।

তাহলে সর্বোচ্চ স্তরের কি অবস্থা?

জান্নাতের লোকদের সংখ্যা পিরামিডের মতো হবে, সর্বনিম্ন পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি লোক থাকবে, তারপর ধীরে ধীরে সংখ্যা কমতে থাকবে, সংখ্যা কমতে থাকবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা পিরামিডের চূড়ায় যাব, পিরামিডের চূড়ায় কতজন থাকবে?

সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকবে শুধু ১ জন। তাই আপনি জান্নাতের সবচেয়ে নিচের স্তরে অনেক অনেক লোক দেখতে পাবেন। এরপর আরও কিছু কমবে, তারপর আরও কমবে, তারপর আরও কমবে, যতক্ষণ না আপনি সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছতে পারবেন ততক্ষণ কমতেই থাকবে। এর ওপরে আর কিছুই নেই, আর এই সর্বোচ্চ চূড়াটা শুধু কেবল একজনের জন্যই সংরক্ষিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শুনবে তখন তোমরাও মুয়াজ্জিনের সাথে তার উচ্চারণ করা শব্দগুলো বলো। এরপর তোমরা আমার ওপর দরুদ পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তাকে দশটি রহমত দান করেন। এরপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য ‘ওয়াসীলা’ প্রার্থনা করো। কেননা, সেটি জান্নাতের এমন একটি মোবারক মানযিল যেখানে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা ব্যতীত আর যেউ যেতে পারবে না। আর আমি আশাবাদী যে আমিই হবো মহান আল্লাহর সেই নির্বাচিত ব্যক্তি। সুতরাং যে আমার জন্য ওসীলার দু’আ করবে তার জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।” (সহীহ মুসলিম, হাদিস ৩৮৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি তুমি আল্লাহর কাছে আমাকে এ স্তরে নেওয়ার প্রার্থনা করো, তাহলে আমি তোমার জন্য বিচার দিবসে শাফায়াত করবো।

যদি প্রত্যেক আযানের পর আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য দু’আ করেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন শাফায়াতের মাধ্যমে দুয়ার পুরস্কার দিবেন।

তাই আযানের পরে যে দু’আ পড়তে হয় তা মুখস্থ করে নিন। আর তা হচ্ছে এই-

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.

অর্থ: “ও আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই নামাজের তুমিই প্রভু। দয়া করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শাফায়াতের অধিকার দাও, আধিপত্য দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো।”

জান্নাতের এই সর্বোচ্চ স্তরের নাম হচ্ছে ‘ওয়াসীলা’। তাই আল্লাহ (সুব) এর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াসীলা দেয়ার জন্য দু’আ করুন। ওয়াসীলা হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান যাকে আল্লাহ (সুব) বিশেষ যত্নসহকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তৈরি করেছেন। এ স্তরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যই সংরক্ষিত। আল্লাহ (সুব) তাঁর জন্য এ স্থানটি সংরক্ষণ করেছেন এবং এটাই হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর। যার ওপরে আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কিছুই নেই। ওয়াসীলার উপরে আছে আল্লাহ (সুব) এর আরশ।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ (সুব) এর সবচেয়ে নিকটে থাকবেন। এটাই হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর।

এরপর আপনি আরও কিছু লোক দেখতে পাবেন যারা অন্যান্য উচ্চস্তরে থাকবে। স্পষ্টত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে উপরের স্তরে থাকবেন, এরপর আল্লাহর আশ্বিয়াগণ। এরপর অন্যান্যরা থাকবেন। হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ نَعِيمِ بْنِ هَمَّارٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الَّذِينَ إِنْ يُلْقُوا فِي الصَّفِّ يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولَئِكَ يَنْطَلِقُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رُثُومُهُمْ، وَإِذَا ضَحِكَ رَثْكٌ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا، فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ

অর্থ: হযরত নুয়াইম ইবনে হাম্মাম রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি খ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলো যে, শহীদদের মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁরা হলো ওই সকল লোক, যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য যায় এবং কোন সময়ই পেছন ফিরে তাকায় না। তারা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের মুখকে ফিরিয়ে নেয় না। তারা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করবে। যখন তাঁরা মারা যায় তখন

আল্লাহ (সুব) তাঁদের জন্য সম্ভষ্টির হাসি হাসেন আর আল্লাহ যদি কারও ওপর এরকম সম্ভষ্টির হাসি হাসেন তাহলে ওই লোককে পরকালে আর কোনো হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে যেতে হবে না।” (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ২১৮৮৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি এতিমদেরকে দেখাশুনা করবে, সে আত্মীয় হোক বা না হোক আমি এবং সে জান্নাতে পাশাপাশি থাকবো।

তো আপনি যদি এতিমদের দেখাশুনা করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিবেশী হবেন।

জান্নাতে এমন কিছু লোক থাকবে যাঁরা নিজেদের আমলের মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছতে পারবে, তারপর তাঁরা দেখবে যে তাঁদেরকে আরও ভালো স্তরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাঁরা জিজ্ঞেস করবে কেন আমাদেরকে উঁচুস্তরে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের আমল আমাদেরকে এই স্তর পর্যন্ত এনেছে, কিভাবে আমাদেরকে এখন আরো উঁচুস্তরে আনা হচ্ছে। তখন তাঁদেরকে বলা হবে, কারণ তোমাদের সন্তানরা তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল।

তাই যদি আপনি আপনার পিতার প্রতি দায়িত্ববান হতে চান, তাহলে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এটা জান্নাতে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে। আপনি আপনার সন্তানকে এই দোয়া শিক্ষা দিন এবং তাকে আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন, কারণ আপনি জান্নাতের একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকবেন, এই দোয়ার কারণে হঠাৎ করে একটি লিফটের মতো কিছু এসে জান্নাতে আপনার স্তর বাড়িয়ে দিবে।

জান্নাতের বাড়ি

আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের ভ্রমণে। আমরা কল্পনা করছি যে, কেউ একজন আমাদেরকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে জান্নাত দেখাচ্ছে। আমি চাই আপনি কল্পনা করুন যে আপনিই সেই ব্যক্তি, আপনি সেখানে আছেন এবং জান্নাত ঘুরে দেখছেন। আপনি জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন এবং এখন আপনি আপনার নিজের বাড়িতে যাবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জান্নাতে একজন তাঁর বাড়িকে তাঁর দুনিয়ার বাড়ির চেয়েও ভালোভাবে চিনবে।”

আপনি অন্তর থেকেই তা অনুভব করবেন। জান্নাতে প্রবেশ করার পর কোন কোন রাস্তা ধরে আপনার বাড়িতে পৌঁছতে হবে তা আপনার অন্তর আপনাকে বলে দিবে। যাত্রা পথে, পথের দু’ধারে আপনি অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখবেন, কিন্তু আপনার মন আকুল থাকবে আপনার বাড়ি দেখার জন্য, আপনি দেখতে চাইবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আপনার জন্য কি সারপ্রাইজ প্রস্তুত করে রেখেছেন। নিজের বাড়িতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আপনি হোমসিক ফিল করছেন।

যাত্রা শেষে এখন আপনি আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সুবিশাল প্রাসাদ তৈরি করে রেখেছেন। সাধারণ বাড়ি নয়, রাজপ্রাসাদ! সে এক অসাধারণ স্থাপত্য, যার ইট পর্যন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। মনভুলানো সব রং, সুবিশাল আকৃতি, স্থাপত্যকর্মের এক শৈল্পিক প্রদর্শনী! এতই অসাধারণ যা আমরা এই পৃথিবীতে কল্পনাও করতে পারি না। দুনিয়ার স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ নিদর্শনকে আপনারা কল্পনা করতে পারেন, অনেকে তাজমহলের সৌন্দর্য অভিভূত হয়, কিন্তু জান্নাতের সাথে কোন কিছুরই তুলনা হতে পারে না।

কারণ দুনিয়াতে সবকিছুরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকে, কিন্তু জান্নাতে এই পৃথিবীর মতো বাধা বা সীমাবদ্ধতা থাকবে না। সেখানে

মাধ্যাকর্ষণ থাকবে না, সেখানে কনক্রিট থাকবে না। আর তাই থাকবে না এসব জিনিসের সীমাবদ্ধতা বা দুর্বল দিকগুলো। তাই জান্নাতে থাকবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত প্রাসাদসমূহ স্থাপত্যকর্মে অতুলনীয়, অকল্পনীয় এবং অসাধারণ! absolute beauty!।

হরের সাথে সাক্ষাৎ!

কিছু আপনার জন্য আরও সারপ্রাইজ আছে, আপনি আপনার রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর প্রাসাদের খুব কাছে যেতেই এমন কিছু দেখবেন যা আপনাকে স্তম্ভিত করে ফেলবে, সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শনে আপনি আনন্দে হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। আপনি যেন নিজের পায়ে ভর করে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না! আপনি আপনার জান্নাতী স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে, আপনি যেন কিছু হার্টবিট মিস করলেন, তিনি আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, বিষয়টি কতো চমৎকার আর আকর্ষণীয় হবে ভাবুন তো একবার!

আপনার স্ত্রীদের ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আপনার প্রাসাদ নিয়ে কিছু আলোচনা করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾

অর্থ: “যারা তাঁদের মালিককে ভয় করে তাঁদের জন্য থাকবে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, যার পাদদেশে ঋণাধারা প্রবাহিত থাকবে, (এটা হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা, আর আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাপ করেন না।” (সূরা কুমার, আয়াত ২০)

আমরা বলেছি, জান্নাতে পৃথিবীর মতো সীমাবদ্ধতা থাকবে না, দুনিয়ার সবকিছুই সীমাবদ্ধ, কোন কিছুই ক্রটিমুক্ত নয়। কিন্তু, জান্নাত ভিন্ন, এখানে জান্নাতের প্রাসাদ শুধু একদিকেই বড় হবে না, তা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকবে, একটার ওপর আরেকটা।

‘প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ’ কাজেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই ভালো জানেন যে, দুনিয়াতে যেমন আমরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ উচ্চতা মাত্র ৩টি ডাইমেনশন দেখি জান্নাতে হয়তো ডাইমেনশন তার থেকেও বেশি হতে পারে। দুনিয়াতে নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকলেও জান্নাত তা থেকে মুক্ত। তাই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ উচ্চতা ছাড়াও আরো কোন দিগন্তের উন্মোচন হবে সেখানে, আল্লাহই ভালো জানেন। হয়তো বা জান্নাতে দিকের সংখ্যা আরো বেশি, এটা যদিও আমার কল্পনা, কিন্তু জান্নাতে তা সম্ভব, কারণ জান্নাত ভিন্ন রকম। এই পৃথিবীর সীমাবদ্ধতা সেখানে নেই। সেই সব প্রাসাদের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদী। জান্নাতের নদী প্রাসাদের পাশ দিয়ে নয়, নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে। আর এসব হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওয়াদা।

কিছু জিনিস আছে যেগুলো পৃথিবীতেও আছে আবার আখিরাতেও তা থাকবে, কিন্তু সেগুলো দুনিয়ার মতো হবে না। যেমন পৃথিবীতে আগুন আছে কিন্তু জাহান্নামের আগুন তার তুলনায় ৭০ গুণ বেশি প্রখর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জাহান্নামের আগুনকে ১০০০ বছর পোড়ানোর পর তা লাল হয়, তারপর আরও ১০০০ বছর পোড়ানোর পর তা কালো হয়ে যায়। কল্পনা করুন... কালো আগুন!

একইভাবে জান্নাতে পানি থাকবে, দুধ থাকবে, মধু থাকবে। কিন্তু পৃথিবীর পানি, দুধ, মধুর সাথে জান্নাতের পানি, দুধ, মধুর শুধু নামেই মিল থাকবে, পরিমাণ ও গুণগত মানের দিক থেকে তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জান্নাতের এমন প্রাসাদ থাকবে যা হবে মুক্তার মতো। যার ভেতর থাকবে না কোন শব্দ দূষণ, থাকবে না কোন ক্লান্তি, শুধু প্রশান্তি আর প্রশান্তি। আপনি দুনিয়াতে আপনার শ্রেষ্ঠ বিশ্রামের স্থানটিকে চিন্তা করতে পারেন, কোলাহলমুক্ত, শান্তিপূর্ণ স্থান। জান্নাত হবে তার থেকেও অনেক অনেক বেশি প্রশান্তিদায়ক -যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

সেই প্রশান্তিদায়ক বাসস্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সেখানে অবস্থানকারী হ্র। যাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾

অর্থ: “আর জান্নাতের তাবুতে জান্নাতীদের জন্য অবস্থান করবে সুরক্ষিত হুরগণ।” (সূরা আর রাহমান, আয়াত ৭২)

হাদীস থেকে আমরা জানতে পাই যে জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে হযরত খাদিজা রাযি. এর ব্যাপারে একটি বিশেষ জান্নাতের সুসংবাদ দেন। তিনি বলেন, এখন আপনার কাছে খাদিজা রাযি. আসবেন, তিনি আসলে তাঁকে বলবেন যে, আল্লাহ তাঁকে সালাম দিয়েছেন আর আমি (জিবরীল) তাঁকে সালাম দিয়েছি। আর সেই সাথে তাঁকে জান্নাতে একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন যা হবে মুক্তার মতো, যার ভেতর থাকবে না কোন শব্দ দূষণ, থাকবে না কোন ক্লান্তি।’

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : " بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ "

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা খাদিজা রাযি. কে জান্নাতের এমন একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দাও যা হবে মুক্তার মতো, যার ভেতর থাকবে না কোন শব্দ দূষণ, থাকবে না কোন ক্লান্তি।” (সহীহ বুখারী, মিশকাতুল মাসাবীহ)

জান্নাতে এমন সব ঘর থাকবে যার ভেতর থেকে বাহির দেখা যাবে আর বাহির থেকে দেখা যাবে ভেতর। এটা কিভাবে সম্ভব! আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু জান্নাতের স্থাপত্য এরকমই হবে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا . قِيلَ

لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ،

وَنَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامَ .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন. “নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন সব

সুন্দর বাড়ি-ঘর থাকবে যার ভেতর থেকে বাহিরে এবং বাহির থেকে ভেতরে দেখা যাবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই প্রাসাদ কাদের জন্য?’ (যখন দুনিয়াতে কোথাও আপনি একটি আলীশান বাড়ি দেখেন, আপনার মনে হয়, এতো সুন্দর বাড়িতে কে থাকে! এই বেদুঈন, তিনি যেন জান্নাতের বাড়ির সামনে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলেন, কাজেই তার মনে প্রশ্ন জেগে উঠলো, এই জান্নাতের প্রাসাদে কে থাকে? কাজেই বেদুঈন প্রশ্ন করলেন, এই প্রাসাদ কাদের জন্য?)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই জান্নাত তাদের জন্য ‘যারা সুন্দর কথা বলে, যারা গরীবদের খাবার দেয়, আর যারা রাতের এমন সময় নামায পড়ে যখন সবাই ঘুমায়।’ (সুনানুত তিরমিযী, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অধ্যায়)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّا لَخِيَمَةٌ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا ، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا
لِلْمُؤْمِنِ أَهْلٌ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স রাযি. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে মুক্তার মতো প্রাসাদ থাকবে যার উচ্চতা হবে ৬০ মাইল এবং তাঁর প্রত্যেক কিনারে জান্নাতি একটি পরিবার থাকবে যা অন্যরা দেখতে পাবে না।” (মিশকাতুল মাসাবীহ)

পৃথিবীতে একটি বাসা তৈরি করতে একজন মানুষকে বছরের পর বছর কষ্ট করতে হয়, কিন্তু এই বাড়ির কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়ত বাড়ি ভেঙ্গে যেতে পারে, কিংবা লোকটি নিজেই মারা যেতে পারে, কিন্তু জান্নাতের বাড়ি আপনার স্থায়ী ঠিকানা। যা কখনোই নষ্ট হবে না, হাতছাড়াও হবে না। সুতরাং সেই চিরস্থায়ী আবাসের জন্য আমাদের চেষ্টা করা দরকার। কাজেই আপনি স্বাভাবিকভাবেই জান্নাতের এই আবাস অনেক বেশি চাইবেন। তবে আমাদের জানা দরকার যে এখন কিভাবে আমরা জান্নাতে নিজের সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারি? এর কি উপায় আছে?

উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ!

প্রথমত:

আপনি যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ আপনার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ ، أَوْ أَصْغَرَ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য মাসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।” (ইবনে মাযা, হাদীস নং ৭৩৮। বুখারী, মুসলিম শরীফে হযরত উসমান রাযি. এর সূত্রে একই হাদীস বর্ণিত আছে।)

দ্বিতীয়ত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কেউ যদি দৈনিক ১২ রাকাত সুন্নত নামায আদায় করে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। সেই সুন্নাতগুলো হলো ফজরের আগে ২ রাকাত, যোহরের আগে ৪ ও পরে ২ রাকাত, মাগরিবের পরে ২ রাকাত আর ইশার পরে ২ রাকাত। তা আপনি চাইলে প্রতিদিন এভাবে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারেন।

পার্থক্যটা দেখুন দুনিয়াতে একটি বাড়ি তৈরি করতে আপনাকে বছরের পর বছর কষ্ট করতে হয়, আর জান্নাতে আপনি তা পারছেন শুধুমাত্র ১২ রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করে। আমাদের উচিত এই লোভনীয় অফার গ্রহণ করা। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এবার চলুন জান্নাতীদের স্ত্রী প্রসঙ্গে আসি। আপনি যখন জান্নাতে আপনার রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে একটি দৃশ্য আপনার হার্টবিট বাড়িয়ে দিলো, আপনার জান্নাতী স্ত্রী আপনার সামনে দাঁড়িয়ে, তিনি আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন, আপনার পা যেন জান্নাতের যমীনে আটকে গেলো। আপনি তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে থেমে গেছেন। সে আপনার জান্নাতের স্ত্রী হউন কিংবা পৃথিবীর স্ত্রী হউন না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা অপরূপ সুন্দরী হবেন। আপনি বসে থাকবেন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে, এমন রূপ যা পৃথিবীর কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. غُرُبًا أَتْرَابًا ﴾

অর্থ: “আমি তাঁদের (হ্রদের) বানিয়েছি চমৎকারভাবে বানানোর মতো করেই। আমি তাঁদের চির কুমারী করে রেখেছি। তাঁরা হবে সম বয়সের প্রেম সোহাগিনী।” (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ৩৫-৩৭)

জান্নাত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একজন আলেম বলেন, একজন মানুষ তাঁর স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ৪০ বছর তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকবে।

আর এই সুন্দরীরা এই কারণে সুন্দর নয় যে, পৃথিবীর কিছু মানুষ তাদেরকে কোন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ঘোষণা করেছে, বরং আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে সুন্দর বলেছেন আর এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَنَاتٌ ﴾

অর্থ: “সেখানে থাকবে সৎস্বভাবের অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীরা।” (সূরা আর রাহমান, আয়াত ৭০)

সুতরাং তাঁরা শুধু সুন্দরীই নন, বরং সৎ স্বভাবেরও এবং আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা যখন তাঁদেরকে সুন্দরী বলেছেন, তখন বুঝতেই পারছেন,

তাঁদের সৌন্দর্য নিয়ে আর কোন সন্দেহ থাকার কোনো নূন্যতম অবকাশও নেই। আর এই সৌন্দর্য আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বোঝানোর জন্য উদাহরণ পেশ করে, সহজ করে বলেন,

عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحاً، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জান্নাতের একজন নারী যদি পৃথিবীতে আসতো, তাহলে আসমান-জমিন আলোয় ভরে যেতো। আসমান জমীনের মধ্যবর্তী অংশ সুস্রাণে ভরে যেতো আর সেই নারীর মাথার দোপাট্টা এই পৃথিবী আর তার ওপর যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতেও উত্তম।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬৮)

দেখুন সূর্য আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও তা এই পৃথিবীকে আলোকিত করে, কিন্তু আমরা যদি এই সৌরজগতের বাইরে যাই তাহলে দেখবো যে সূর্যের আলো সেখানে নেই। কিন্তু জান্নাতের একজন নারী তাঁর আলো দিয়ে আসমান-জমিন আলোকিত করে ফেলবে, নূর! কল্পনা করুন তাঁর সৌন্দর্য। তাঁর মাথার এক টুকরো কাপড় এই পৃথিবীর সবকিছুর চাইতে উত্তম। সুবহানাল্লাহ!

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাপড় উপহার হিসেবে পান, সেই কাপড় দেখে সাহাবারা তা বারবার ছুঁয়ে দেখছিলেন। তাঁদের দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘জান্নাতে সা’দ বিন মুয়াযের রুমালও এর চাইতে উত্তম।’

মূল কথা হচ্ছে জান্নাতের সবকিছু, সবকিছুই পৃথিবীর থেকে উত্তম।

জান্নাতের নারী-পুরুষ

জান্নাতের নারীরা যেমন বিশেষভাবে তৈরি, তেমনি জান্নাতে পুরুষরাও হবে বিশেষভাবে তৈরি। বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে আমাদের উচ্চতা হবে আদম (আ)-এর সমান, আমরা হবো ইউসুফ (আ)-এর মতো সুন্দর আর আমাদের বয়স হবে ইসা (আ)-এর সমান অর্থাৎ ৩৩ বছর। আর জান্নাতে পুরুষদের শক্তি সামর্থ্যও হবে অনেক বেশি।

তিরমিযির বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘জান্নাতে একজন পুরুষের শক্তি হবে পৃথিবীর ১০০ জন পুরুষের সমান।’ এগুলো এখন আমাদের কাছে শুনতে আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্য। সুতরাং জান্নাতে সবকিছুই হবে বেশি বেশি, তা পরিমাণের দিক থেকে হোক আর গুণগত মানের দিক থেকেই হোক। হরদের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾

অর্থ: “এরা যেন এক একটি প্রবাল ও পদ্মরাগ।” (সূরা আর রাহমান, আয়াত ৫৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘জান্নাতের নারীদের অস্থিমজ্জা তাঁদের কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেখা যাবে।’

আমি যখন বিষয়টা নিয়ে ভাবি তখন মনে হয়, এটা কিভাবে সম্ভব! আর তা সৌন্দর্যেরই বা কি কারণ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখেছেন, আর তিনি আমাদের কাছে তা পৌছে দিয়েছেন, কিন্তু যেহেতু আমরা এটা কল্পনা করতে পারছি না, তার মানে এই নয় এটা সুন্দর নয়। জান্নাত একটি ভিন্ন জগত।

তো...! আপনি অনেক বছর কাটিয়ে দিয়েছেন আপনার স্ত্রীকে দেখে। এখন আপনি আপনার প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন। আপনি যা দেখছেন, সবই আপনার কাছে নতুন মনে হচ্ছে। সবকিছুই এক একটা অভিজ্ঞতা।

একটা শিশুর ক্ষেত্রে কি ঘটে? তার কাছে সবকিছুই নতুন, তাই সে যা দেখে তাতেই মজা পায় এবং তাকিয়ে থাকে। একইভাবে আপনিও, জান্নাতের প্রাসাদের আসবাবপত্র দেখে অভিভূত হয়ে যাবেন, এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবেন আর বলবেন আলহামদুলিল্লাহ!

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وَزُرَابِيٌّ مَثُوثَةٌ﴾

অর্থ: “তাতে থাকবে (সুসজ্জিত) উঁচু উঁচু আসন, (সাজানো থাকবে) নানান ধরণের পানপাত্র, (আরাম-আয়েশের জন্য থাকবে) সারি সারি গালিচা ও রেশমের বালিশ। বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি।” (সূরা গাশিয়াহ আয়াত ১৩-১৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿مُتَكِينِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَاجُنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾

অর্থ: “আর জান্নাতীরা প্রশস্ত আসনে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে আয়তলোচনা হুরদের বিবাহ করিয়ে দিবো।” (সূরা তুর, আয়াত ২০)

জান্নাতে আসবাবপত্র সাজানোর ব্যবস্থাও হবে অসাধারণ। -interior design! বা ফার্নিচারগুলো যেভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সেটাই একটা সৌন্দর্য। কল্পনা করুন একজন ফেরেশতা থাকবেন যিনি হবেন আসবাবপত্র সাজানোর ব্যাপারে পারদর্শী। এই অসাধারণ জিনিসগুলো কেনার জন্য আপনাকে অথবা আপনার স্ত্রীকে মার্কেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয় নি। এসব কিছুই আপনার জন্য তৈরি করে রাখা আছে। আপনার সাথে আপনার স্ত্রীও সেই সব আসবাবপত্রের বিন্যাস দেখে অভিভূত হয়ে পড়বেন। তাঁর মনে পড়বে পৃথিবীতে তাঁর সাজানো ঘরের কথা আর সেই ঘরের সাথে জান্নাতের তুলনা করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারবেন; জান্নাত অতুলনীয়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আরও বলেন,

﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ﴾

অর্থ: “তাঁরা এবং তাঁদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনের ওপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে।” (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৫৬)

সেই গালিচার ওপর বসে আপনি এক অন্যরকম অনুভূতি পাবেন। আপনার জন্য সেখানে বসে থাকাও হবে আনন্দের। আপনি কয়েক মাস সেখানে বসেই কাটিয়ে দিবেন। আর আমি যখন বলছি যে আপনি মাসের পর মাস কাটিয়ে দিবেন, তা কিন্তু মোটেও অতিরঞ্জিত বর্ণনা নয়, কারণ জান্নাতে আপনার কোন তাড়াহুড়ো থাকবে না, আপনার কোন মিটিং থাকবে না, কোন কাজের চাপ থাকবে না, সময়ের কোন চিন্তা থাকবে না। আপনার সময় অফুরন্ত। আপনি যা যতক্ষণ করতে মন চায় করতে পারেন। এমনও হবে যে আপনি আপনার প্রাসাদ থেকে বের হলেন এবং একটি সুন্দর গোলাপ দেখতে পেলেন। আপনি সেটার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য সেখানে এক বছর বসে থাকবেন। আপনার তো কোন কাজ করতে হবে না, আপনার কোন তাড়া থাকবে না। জান্নাতে আপনার কাছে অফুরন্ত সময় থাকবে আপনার যা ইচ্ছা হয় তা করার জন্য। তো আপনি ও আপনার স্ত্রী সেই গালিচার ওপর কয়েক মাস কাটাবেন, আপনারা কথা বলবেন কবরের সময় নিয়ে, কিয়ামত দিবসের সময় নিয়ে।

তারপর আপনার স্ত্রী বলবেন, ‘চলো, আমাদের অন্যান্য সম্পত্তি দেখে আসি।’

আপনি বলবেন, ‘না, আমি এত সুন্দর গালিচা থেকে এখন উঠতে চাই না।’

আপনার স্ত্রী বলবেন, ‘তুমি পৃথিবীতে আমাকে বাইরে যেতে দাও নি।

চলো এখন যাই আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন আমরা তা দেখে আসি।’ সেই কথা শুনে আপনারা দু’জন বের হয়ে যাবেন আপনাদের বাগানসমূহ দেখার জন্য।

কত বড় হবে জান্নাতের সেই বাগানগুলো?

জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরে যে ব্যক্তি থাকবে তাঁকে এই পৃথিবীর ১০ গুণ পরিমাণ জায়গা দেয়া হবে। আর আমরা যদি উচ্চস্তরের কথা বলি, তাহলে মনে হয় আলোকবর্ষে হিসাব করতে হবে। জান্নাতের এক স্তরের সাথে অন্য স্তরের পার্থক্য হবে বিশাল।

﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾

অর্থ: “ভেবে দেখো, আমি তাদের কতককে কতকের ওপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখিরাত নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর।” (সূরা ইসরা, আয়াত ২১)

কিশোরদের আপ্যায়ন :

আপনারা দু'জন এখন বেড়াতে যাচ্ছেন, তার আগে আপনার ইচ্ছা হলো কিছু খেয়ে নিবেন, কিছু পান করবেন। যখন আপনার মনে ইচ্ছা হলো, তখনই আপনি দেখলেন যে চারপাশে অনেক কিশোর আপনাদের জন্য বিভিন্ন খাবার নিয়ে ঘুরছে। তাঁরা সকলেই সুন্দর কাপড় পরিধান করে আছে, অসাধারণ সব জিনিস তাঁরা পরিবেশন করছে। সেইসব কিশোরদের দেখে, তাঁদের হাসি দেখে, তাঁদের ব্যবহার, আপ্যায়নে আপনি মুগ্ধ। (একটি উদাহরণ, আপনারা দেখেছেন দুনিয়াতেও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের সাথে কিশোর বাচ্চারা আসেন, তাদেরকে মাঠে নিয়ে আসেন)

ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘জান্নাতীদের খাবার পরিবেশন করবে কিশোরেরা, তাঁরা চিরকাল থাকবে, তাঁদের বয়স বাড়বে না।

আপনি দেখবেন তাঁদের সংখ্যা অনেক, তারা সকলে আপনার সেবায় নিয়োজিত। আরো দেখবেন তাঁরা কতটা উৎসাহী! আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আর তাঁদের চেহারার সৌন্দর্য, তাঁদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য, তাঁরা সব সময় হাসতে থাকবে, আর তাঁদের পরনের কাপড়ের রং আর অলংকার

সবকিছু দেখে আপনার মনে হবে তাঁরা যেন ছড়ানো-ছিটানো মুজা।’ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا﴾

অর্থ: “তাঁদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করবে একদল কিশোর বালক, যারা চিরকিশোর থাকবে, যখন তুমি এদের দিকে তাকাবে মনে হবে এরা বুঝি কতিপয় ছড়ানো-ছিটানো মুজা।” (সূরা ইনসান আয়াত ১৯)

আপনার নিজের কোন কাজ করতে হবে না, আপনার স্ত্রীর কোন কাজ করতে হবে না, তাঁকে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হবে না, পরিশ্রমের কোনো কাজও করতে হবে না। আপনারা শুধু উপভোগ করতেই থাকবেন, করতেই থাকবেন এবং আপনারা সেখানে কিছু খেয়ে, কিছু পান করে নিয়ে বের হয়ে পরবেন ভ্রমণে।

জান্নাতের মাটি হবে মিশক :

হতে পারে আপনারা সাথে একজন গাইড রাখবেন আপনার বিশাল বাগানগুলো ঘুরে দেখানোর জন্য। আপনি আপনার প্রাসাদ থেকে বের হতে না হতেই আপনার নাকে একটা সুগন্ধ আসবে যা আপনাকে পাগল করে দিবে। আপনি ভাববেন এই সুগন্ধ কোথেকে আসছে? আপনি সেই সুগন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে বুঝবেন যে জান্নাতের মাটি থেকে সেই সুগন্ধ আসছে।

আপনি সেই মাটি হাতে নিবেন, সেই মাটি হবে বিস্কৃত সাদা মিশক।

আপনার তখন মনে হবে এই মাটি মনে হয় আল্লাহ শুধু আপনাকেই দিয়েছেন কিন্তু বাইরে গিয়ে আপনি বুঝবেন যে পুরো জান্নাতেই এই মিশকের মাটি থাকবে। বুখারীর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, *وَإِذَا طَرَبَهَا الْمَسْكُ* ‘এবং তাঁর মাটি হবে মিশক।’

তারপর আপনি পানির আওয়াজ পাবেন। আপনি আপনার গাইডকে জিজ্ঞেস করবেন, ‘এটা কিসের আওয়াজ?’ সে বলবে এটা আপনার নদী, আর তা আপনার প্রাসাদের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আপনি সেই স্বচ্ছ

পানির নদী থেকে পানি পান করবেন আর উপলব্ধি করবেন যে এই পানি পৃথিবীর পানি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তাই আপনি সেখানে বসে কাপের পর কাপ পানি পান করতেই থাকবেন। আপনি জান্নাতে তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পানি পান করবেন না, কারণ একজন জান্নাতবাসী আগেই এমন এক পানি পান করবে যার পর তাঁর আর কোনদিন তৃষ্ণা পাবে না। সেটা হলো হাউজে কাউসারের পানি।

কিয়ামতের দিন আল-কাউসারের একাংশ হাশরের ময়দানে নিয়ে আসা হবে জান্নাত থেকে। সেটার পাশে কে দাঁড়িয়ে থাকবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্য পানি ঢেলে দিবেন। আর তিনি তাঁর নিজের হাতে তা পরিবেশন করবেন। ভাবতে পারেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে আপনাকে পানি পান করানোর জন্য অপেক্ষা করছেন!

আপনি যদি মুসলিম হোন আর আপনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফায়াতের প্রার্থনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে ডেকে নিয়ে আল-কাউসার থেকে পানি পান করাবেন। এসো, পান করো! সুবহানাল্লাহ!

আর সেই এক কাপ পানি অনন্তকালের জন্য আপনার তৃষ্ণা মিটিয়ে দিবে, তারপর আপনি আর কোনদিন পিপাসার্ত হবেন না।

তাহলে জান্নাতের লোকেরা খাচ্ছে কেন, তাঁরা পান করছে কেন?

জান্নাতিরা খাওয়া-দাওয়া করবে শুধু আনন্দের জন্য। তাঁদের খাবারের প্রয়োজন হবে না, তাঁদের তৃষ্ণাও পাবে না, তাঁরা খাবে আর পান করবে শুধু উপভোগ করার জন্য। আপনি এতো পানি পান করবেন কিন্তু তা আপনার দেহে থাকবে না। তা ঘাম হিসেবে বের হয়ে যাবে যদিও তাঁর গন্ধ হবে মিশকের।

আপনি যখন আপনার নদী থেকে কাপের পর কাপ পান করছেন আপনার গাইড আপনাকে বলবে যে আপনার আরও নদী আছে যা এটার চেয়েও উত্তম। আপনি তখন সেই নদীর কাছে যেতে চাইবেন। আপনি আপনার

স্ত্রী আর গাইড হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করবেন সেই নদীর কাছে পৌঁছার জন্য।

দুনিয়াতে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেয়, কেউ যায় নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে, কিংবা কেউ যায় গ্রাণ্ড ক্যানিয়নে। এবারে জান্নাতে আপনি এবং আপনার স্ত্রী যাচ্ছেন, সেরকমই একটি অসাধারণ নদী দেখতে!

দুধ, মধু ও সুধার নহর :

জান্নাতের যোগাযোগ ব্যবস্থা যে অসাধারণ হবে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনার ইচ্ছা হলে আপনি ধীর গতির যানে যাবেন, আশপাশের দৃশ্য দেখে দেখে যাবেন, ইচ্ছা হলে দ্রুতগতির যানে যাবেন। আপনি সেখানে পৌঁছে দেখবেন যে সেটা হচ্ছে দুধের নদী। আপনি তা পান করেই বুঝবেন যে তা এই পৃথিবীর দুধের মতো না।

আপনি এবং আপনার স্ত্রী যখন পান করতেই থাকবেন, তখন আপনার গাইড বলবে যে আপনার আরও একটি নদী রয়েছে যা এটার চাইতেও উত্তম। আপনারা কল্পনা করতে পারেন সমুদ্র দেখার অনুভূতির সাথে, সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন অনুভূতি হয়। কিংবা নদী, পাল তোলা নৌকা টেউ ইত্যাদি, এমনকি দুনিয়ার এই দৃশ্যগুলোই আমাদের নয়ন জুড়িয়ে দেয়, তাহলে চিন্তা করুন, যখন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেরকমই জান্নাতের বহমান একটি নদীর সামনে, কত অপরূপ হবে সে দৃশ্য!

সেই নদীর কাছে গিয়ে আপনি দেখবেন যে তা হচ্ছে মধুর নদী। আপনি সেই মধুও পান করবেন। আর তারপর আপনি শেষ নদীটির কাছে যাবেন। আর সেটা হবে সুধার নদী। সুধা মানে মদ। কিন্তু মদ শব্দটা শুনতে খারাপ শোনায়, কাজেই আমরা বলেছি সুধার নদী। কিন্তু এই মদের নদী হবে ভিন্ন রকম, এখানে আপনি মদের ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে মুক্ত, এটা কেবল আপনাকে আনন্দ দেবে, মাদকতা, ঝিমঝিমভাব, মাথা ব্যথা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হবে এই সুধা। কারণ জান্নাতি সুধা দুনিয়ার মদের মতো নাপাক বা ক্ষতিকর হবে না, এটা হবে পিউর ও পবিত্র।

আপনি সেখানে কিছুক্ষণ থাকবেন সেই নদী থেকে পান করার জন্য যা আপনাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দিয়েছেন। তারপর আপনি জান্নাতের ঝরণাসমূহ দেখতে বের হবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾

অর্থ: “আল্লাহ তা'আলাকে যারা ভয় করে তাঁদের যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে; সেখানে নির্মল পানির ফোয়ারা রয়েছে, রয়েছে দুধের এমন কিছু ঝর্ণাধারা যার স্বাদ কখনও পরিবর্তিত হয় না, রয়েছে পানকারীদের জন্য সুধার নহরসমূহ, রয়েছে বিশুদ্ধ মধুর ঝর্ণাধারা।” (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৫)

আপনার গাইড আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি সেই ঝরণাসমূহ দেখতে চান কি না? আপনি বলবেন ‘হ্যাঁ’। কিন্তু সে বলবে তার চেয়েও ভালো কিছু রয়েছে। ‘চলুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নদীটি দেয়া হয়েছে তা দেখে আসি।’ আর সেটাই হলো ‘আল কাউসার’ নামক নদী।

আপনি জিজ্ঞেস করবেন, ‘আমি কি সেখানে যেতে পারবো?’

উত্তরে বলা হবে ‘হ্যাঁ’।

আপনি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত হোন তাহলে আপনি তাঁর নদীতে যেতে পারবেন আর সেখান থেকে পানও করতে পারবেন। এটা হচ্ছে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নদী আর তাঁর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে আল্লাহর আরশ।

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا بَنُورٍ حَافَتَاهُ قَبَابُ الدَّرِّ الْمَجُوفِ ، قَالَ : فَضْرَبْتُ بِيَدِي فَإِذَا طِينُهُ مَسْكٌ أَذْفَرُ ، قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ . قَالَ : هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ .

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মিরাজের রাতে আমাকে যখন জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি একটি নদী দেখতে পাই যার পাশে রয়েছে ফাঁপা মুক্তার তাবু। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘এটা কি?’ জিবরাঈল বললেন, ‘এটা হলো ‘আল কাউসার’ যা আপনার প্রভু আপনাকে দিয়েছেন। দেখুন এর মাটি হচ্ছে মিশকের তৈরি!’ (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

একটি বিষয় আপনারা যখন শুনছেন যে, আপনার একজন গাইড থাকবে তখন আপনারা হয়তো ভাবছেন যে আমি এসব বানিয়ে বলছি! কিন্তু না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জান্নাতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর একজন গাইড ছিলেন, তাঁর গাইড ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তো জান্নাতে আপনার গাইড থাকাতে আসলে কোন সমস্যা নেই।

জান্নাতে আপনাকে সবসময় খেদমত করা হবে। ঘরের ভেতরে ঘরের বাইরে, সব জায়গায় আপনার খেদমতে থাকবে বিভিন্ন জন। আপনি আপনার গাইডের সাথে ‘আল-কাউসারে’ গেলেন, সেখান থেকে পান করলেন।

আপনার এই পুরো ভ্রমণটা অসাধারণ কাটছে। আপনার কোন টাকা খরচ হচ্ছে না। সবকিছুই পুরো ফ্রি।

আর এই ভ্রমণ শেষ করতে আপনার বেশ কয়েক বছর লেগে গিয়েছে। আর এখন আপনি পরিকল্পনা করছেন জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ দেখার জন্য। আপনি জান্নাতের বিভিন্ন ঝর্ণা পরিদর্শন করছেন এবং এই ঝর্ণাগুলোর নাম

আপনি দুনিয়া থেকেই জানেন। কারণ আপনি কুরআন পড়তেন। যেমন একটির নাম সালসাবিল, আরেকটি হচ্ছে ‘কাফুরের’ ঝর্ণা। এখন আপনি সেই সব ঝর্ণা দেখতে চাইবেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْأَنْبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾

অর্থ: “নিঃসন্দেহে যারা সৎকর্মশীল তাঁরা জান্নাতে এমন সূরা পান করবে যার সাথে (সুগন্ধযুক্ত) কাফুর (কপূর) মেশানো থাকবে। এ (কপূর মেশানো) পানি হবে প্রবাহমান (এক) ঝর্ণা, যার (প্রবাহ) থেকে আল্লাহর নেক বান্দারা সদা পান করতে থাকবে। তাঁরা (যেদিকে যখন ইচ্ছা) এ (ঝর্ণাধারা)-টা প্রবাহিত করে নেবে।” (সূরা ইনসান, আয়াত ৫-৬)

আপনি সেখানে গিয়ে দেখবেন যে অন্যান্য মুমিনরা সেখান থেকে পান করছে। আপনি তাঁদের কাছে যাবেন, তাঁদের সাথে কিছুক্ষণ গল্প করবেন, সূরা পান করবেন। তারপর আপনি আপনার নতুন গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হবেন। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْأَنْبَرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ. خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾

অর্থ: “নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নেয়ামতে থাকবে। এরা সুসজ্জিত আসনে বসে সব অবলোকন করবে। এদের চেহারায় নেয়ামতের সজীবতা তুমি চিনতে পারবে। ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে। কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ করা। এতে (বিজয়ী হবার জন্য) প্রতিটি প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা করুক। আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।” (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ২২-২৫)

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা আরও বলেন,

﴿ وَنُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾

অর্থ: “সেখানে তাঁদের এমন এক সূরা পান করানো হবে, যার সাথে মেশানো হবে ‘যানযাবীল’, তাতে রয়েছে এক অমিয় ঝর্ণা, যার নাম হচ্ছে সালসাবীল।” (সূরা ইনসান, আয়াত ১৭-১৮)

আপনি একের পর এক ঝর্ণা দেখতে থাকবেন, বছরের পর বছর অতিবাহিত হতে থাকবে, আপনি খেয়াল করবেন যে জান্নাতে কোন চন্দ্র অথবা সূর্য নেই, রাত নেই, দিনও নেই। নেই গ্রীষ্ম, নেই শীত, নেই বসন্ত। আপনি চিন্তা করবেন জান্নাতে একটি দিন কত বড়?

এখানে কি আদৌ রাত হবে?

আপনি বুঝতে পারবেন যে জান্নাতে কোন ঘুম নেই, সেখানে সবসময় আলো থাকবে। দিন আর রাতের পার্থক্য বুঝতে পারবেন আল্লাহর আরশের নিচে থেকে আসা আলোক রশ্মি থেকে। জান্নাত সবসময় আলোকিত থাকবে।

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন,

ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور دائم.

অর্থ: “জান্নাতে কোন রাত অথবা দিন নেই, সেখানে সবসময় আলো থাকবে।”

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন,

والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش.

অর্থ: “জান্নাতে সূর্য নেই, চন্দ্রও নেই, রাত নেই, দিন নেই। সকাল থেকে দুপুর আলাদা করা যাবে আরশের নিচে থেকে আসা আলোক রশ্মি দেখে।”

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا﴾

অর্থ: “তা চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ওয়াদা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন গায়েবের সাথে। নিশ্চয় তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। তারা সেখানে ‘শান্তি’ ছাড়া কোন অর্থহীন কথা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের রিয্ক। সেই জান্নাত, আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাকীদেরকে আমি যার উত্তরাধিকারী বানাবো।” (সূরা মারইয়াম, আয়াত ৬২-৬৩)

আপনি এখনও আপনার গাইডের অনুসরণ করছেন, হঠাৎ আপনি এক মস্ত বড় গাছ দেখতে পেলেন। আপনি জানতে পারবেন এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বলা সেই গাছ, যার বর্ণনা আমরা হাদীস থেকে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكِيبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জান্নাতে এমন এক গাছ থাকবে, যা এতো বিশাল হবে যে একজন সওয়ারী সেই গাছের ছায়ায় একশ বছর যাত্রা করলেও তা শেষ হবে না।” (সহীহ মুসলিম)

তারপর আপনি যেখানেই যান না কেন আপনি নতুন নতুন গাছ দেখতে পাবেন, প্রতিটা গাছ ভিন্ন। আপনি অবাক হবেন আর আপনার গাইডকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, ‘এখানে এমন গাছ রয়েছে যার সব ডাল স্বর্ণ, আরও গাছ রয়েছে যার ডাল রৌপ্য নির্মিত। এমন গাছ রয়েছে যা কাপড় উৎপন্ন করে, রয়েছে ফল প্রদানকারী গাছ।’

আপনার গাইড আপনাকে বিশেষ কিছু গাছ দেখাতে নিয়ে যাবে, যেমন আপনার গাইড আপনাকে বিশেষ কিছু গাছ দেখাতে নিয়ে যাবে, যেমন ‘সিদরাতুল মুত্তাহা’। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

“আমাকে যখন সিদরাতুল মুত্তাহায় নিয়ে যাওয়া হয়, আমি দেখতে পাই- أوراقها مثل آذان أليفه في الحجم، وثمارها كالقلال أي الجرار الكبار. অর্থ: “তার পাতাগুলো হাতির কানের মতো, আর তার ফলগুলো মাটির বড় মটকার মতো।”

জান্নাতীদের পোশাক :

عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة؛ خلقا تخلق أم نسجاً تنسج ؟ فضحك بعض القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عالماً " ؟ ! ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " أين السائل ؟ " قال : ها هو ذا أنا يا رسول الله . قال : " لا ، بل تشقق عنها ثمر الجنة " . ثلاث مرات .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত নিয়ে কথা বলছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতের কাপড় সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে বলুন, তা কি তৈরি থাকবে, নাকি তা হাতে বোনা হবে?’

এই প্রশ্ন শুনে সাহাবারা হেসে উঠলেন। (তাঁদের মনে হল এই প্রশ্নটা অবাস্তব।)

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তোমরা হাসছ কেনো? একটা অজ্ঞ মানুষ একজন বিজ্ঞ মানুষকে প্রশ্ন করছে বলে?”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন প্রশ্নই অবাস্তব হতে পারে না, একজন মানুষ না জানলে সে প্রশ্ন করতেই পারে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মানুষটির প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “জান্নাতের পোশাক জান্নাতের গাছ থেকে উৎপন্ন হবে।” (মুসনাদে আহমাদ)

আপনি আর আপনার স্ত্রী কোন গাছের নিচে যাবেন, গিয়ে আপনি একটি ফলের দিকে নির্দেশ করতেই তা আপনার জন্য নতুন কাপড় বের করে দিবে। আপনি কাপড় সংগ্রহ করবেন, আপনার স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে কাপড় নিবে, স্বাভাবিকভাবেই সে অনেক কাপড় নিবে।

জান্নাতের ফল :

আপনি সে সব কাপড় নিয়ে আবার চলতে শুরু করবেন, আপনার কাপড় নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেকজন খাদেম থাকবে। আপনি আরেকটি গাছের কাছে আসবেন, দেখবেন সেটা কমলালেবুর গাছ, আপনি কিছুদিন আগেই কমলালেবু খেয়েছেন। আপনার গাইড জিজ্ঞেস করবে আপনি সেই ফল খেতে চান কি না। আপনি বলবেন, ‘না, এটা তো আমি আগেই খেয়েছি’। আপনার গাইড আপনাকে একটি কমলালেবু দিবে, আপনি সেটা খেয়ে দেখবেন যে তা আগেরটার চেয়ে ভিন্ন। এই কমলালেবু বেশি সুস্বাদু। আপনার খাওয়া প্রতিটা কমলালেবু তার আগেরটার চেয়ে ভালো হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন,

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: “আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাঁদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাঁদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তাঁরা বলবে, ‘এটা তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল।’ আর তাঁদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাঁদের জন্য তাতে থাকবে পৃথকপৃথক স্ত্রীগণ এবং তাঁরা সেখানে হবে স্থায়ী।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২৫)

জান্নাতের বাসিন্দারা অভিযোগ করবে যে তাঁদেরকে আগেও এই একই ফল দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারবে যে এই ফলের স্বাদ

আগের চেয়ে ভিন্ন এবং উত্তম। দেখুন জান্নাতবাসীদের রুচি কতটা উন্নত, তাঁরা এক ফল দুইবার খেতে চাইবে না। যতবার তাঁরা একই ফল খাবে, ততবার সেই ফলের স্বাদ বৃদ্ধি পাবে।

তিরমিযির বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٍ إِلَّا سَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ . "

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “জান্নাতের গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণ নির্মিত।” (সুনানুত তিরমিযী, আবু দাউদ)

এখন চলুন আমরা দেখি কিভাবে একজন মানুষ জান্নাতে তাঁর গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রজনীতে ইব্রাহিম আ. এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইব্রাহিম আ. হলেন এই উম্মতের পিতা, তিনি আমাদের পিতা। আর তাই তিনি আমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো জিনিসটা কামনা করেন।

যদিও ইব্রাহিম আ. আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তারপরও তিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে চান। যেহেতু তিনি এখন জান্নাতে রয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন। তিনি এই উম্মতকে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। যা হাদীসের মাঝে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، أَقْرَأُ أَمْتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيَعَانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. "

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মি’রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম আ. এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমাকে বলেন, ‘হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতকে আমার সালাম দিও। তাদেরকে বলে দিও যে জান্নাত অনেক সুন্দর। জান্নাতের পানি সুমিষ্ট, জান্নাতের মাটি অনেক উর্বর, আর জান্নাত হচ্ছে শূন্য প্রান্তর। আর জান্নাতের গাছ হচ্ছে, ‘সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।’

আপনি যদি নিজের জন্য জান্নাতে একটি গাছ চান, আপনাকে শুধু এই কথাগুলোই বলতে হবে। ‘সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।’

ভাই ও বোনেরা! আপনারা দুনিয়ায় বসে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করুন। সেখানে প্রাসাদ তৈরি করুন। জান্নাতে যাওয়ার আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আর আপনি যদি জান্নাতে অনেক মূল্যবান সম্পদ চান, তাহলে ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ পড়ুন।

জান্নাতের পশু-পাখী :

জান্নাতের পশু-পাখিরা কেমন হবে?

— حديث ثوبان — رضي الله عنه — أن نبي الله — صلى الله عليه وسلم — سئل عن شراب حوضه، فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. رواه مسلم.

অর্থ: হযরত ছাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন ‘আল কাউসার’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, “এটা একটি নদী যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, তাঁর পানি দুধের চেয়েও সাদা আর মধুর চেয়েও মিষ্টি।” (সহীহ মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيلَ عَنْ الْكَوْثَرِ ، فَقَالَ هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ ، أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَقُهَا كَأَعْنَقِ الْجُرُزِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ . قَالَ : أَكَلْتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا يَا عُمَرُ .

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘আল কাউসার’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, “এটা একটি নদী যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, তাঁর পানি দুধের চেয়েও সাদা আর মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর সেই নদী থেকে পানি পান করে এমন সব পাখি, যাদের গলা হচ্ছে উটের গলার মতো। উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ, এই পাখিরা তো আনন্দে আছে।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘হে উমর, যারা সেই পাখিগুলো খাবে তাঁরা আরও বেশি আনন্দে থাকবে।’ (সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৪২। মুসনাদে আহমাদ)

হাউজে কাউসার হতে পান করবে মস্ত বড় পাখি এবং তা পুরোপুরি প্রাকৃতিক। এখানে কোন হরমোনের ব্যাপার নেই। আমরা সাধারণত বড় আকারের সাথে হরমোনের বিষয়টা টেনে আনি। কিন্তু জান্নাতের পাখি হবে সম্পূর্ণ ভেজাল মুক্ত।

একটি পাখি উড়তে দেখে যদি তা আপনার পছন্দ হয়, আপনি শুধু তার দিকে নির্দেশ করতেই তা আপনার জন্য ভূনা, রোস্ট কিংবা বারবিকিউ প্রস্তুত অবস্থায় আপনার সামনে পরিবেশন করা হবে। চুলা গরম হওয়ার জন্য কোন অপেক্ষা করতে হবে না, রান্না হওয়ার জন্য কোন সময় লাগবে না। যখন চাইবেন তখনই পেয়ে যাবেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَحْمٌ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾

অর্থ: “আর তাদের জন্য তাদের প্রত্যাশিত থাকবে পাখির গোশত।” (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ২১)

তো আপনি আর আপনার স্ত্রী ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন খাবার চেখে দেখছেন, আল্লাহ আপনাকে যা যা দিয়েছেন তা দেখছেন আর আপনি বুঝতে পারছেন যে আল্লাহর দেয়া পুরস্কার শেষ হচ্ছে না। তাই এবার আপনি ঘরে ফিরে যাবেন বিশ্রাম নিতে এবং নিজেকে উপভোগ করতে।

একবার চিন্তা করুন, যদি জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তর হয় দুনিয়ার দশ গুণ, তাহলে একটা মানুষের তার নিজের সম্পত্তি দেখতে কত বছর লাগতে পারে ভাবুন।

আপনি যে দেশে বাস করেন, সেই দেশের আপনি কতটুকু দেখেছেন? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আপনি সে দেশের ২৫ ভাগও দেখেন নি। আপনি হয়তোবা ৪-৫ টা শহর ঘুরে দেখেছেন, যাত্রার সময় দু-পাশের দৃশ্য দেখেছেন। কিন্তু তা পুরো দেশের তুলনায় খুবই কম ও তুচ্ছ। আর আপনি যে দেশে থাকেন, সেটাও তো কত ছোট!

এই পৃথিবীর চার-পঞ্চমাংশ হচ্ছে পানি, তার মধ্যে ছোট্ট একটি দেশ আমরা দেখে শেষ করতে পারি না। সুতরাং ভাবুন, আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে যে সম্পত্তি দিবেন তা দেখে শেষ করতে আপনার শত শত বৎসর লেগে যাবে।

আপনি যখন আপনার বাসায় ফিরে যাবেন, সেখানে আপনাকে পানীয় পরিবেশন করা হবে। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া' তা'আলা বলেন,

﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ

بِضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾

অর্থ: “নিয়ামত সমৃদ্ধ জান্নাতে তারা অবস্থান করবে। তারা একে অপরের সামনে হেলান দিয়ে আরাম করে বসবে। ঘুরে ঘুরে বিশুদ্ধ সূরা তাঁদের পরিবেশন করা হবে। শুভ্র ও সমুজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে কোন রকম মাথা ঘুরানির মতো ক্ষতিকর কিছু থাকবে না এবং তার কারণে তাঁরা মাতালও হবে না।” (সূরা সাফফাত, আয়াত ৪৫-৪৮)

অন্যত্র এই পানীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾

অর্থ: “ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে এদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে। কস্তুরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ করা। এতে (বিজয়ী হবার জন্য) প্রতিটি প্রতিযোগীই প্রতিযোগিতা করুক।” (সূরা মুতাকফফীন, আয়াত ২২-২৫)

ইবনে কাছির বলেন,

لا تصدع رؤوسهم، ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطرية واللذة الحاصلة.

অর্থ: “এই পানীয় তাঁদের মাথা ব্যথার কারণ হবে না, এটা তাঁদের মাতালও করবে না। বরং এর দ্বারা তারা এক স্বর্গীয় স্বাদ অনুভব করবে।” কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ لَا يُصَدَّغُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ﴾

অর্থ: “তা পানে না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে।” (সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত ১৯)

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, “মদের চারটি খারাপ দিক রয়েছে।

প্রথমটি হলো মাদকতা। দ্বিতীয়ত, মাথা ব্যথা। তৃতীয়ত, মূত্রের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং চতুর্থ ও শেষটি হলো বমি হওয়া। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া' তা'আলা জান্নাতের মদকে এই চারটি খারাপ দিক থেকে পবিত্র করেছেন।”

জান্নাতের বাসিন্দারা কখনও মাতাল হবে না। তাঁরা অনেক মদ পান করবে কিন্তু তাঁরা মাতাল হবে না। এটা তাদেরকে খুশি করবে, তাঁরা আনন্দিত হবে। দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু সবই হলো ভালো আর মদের মিশ্রণ। এখানে সম্পূর্ণ পবিত্র কিছুই নেই, পুরোপুরি ভালো যেমন নেই, পুরোপুরি খারাপও নেই। এজন্যই আল্লাহ এই পৃথিবীকে জান্নাত অথবা

জাহান্নাম বানান নি। জান্নাত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো যেমন এই পৃথিবী নয়, তেমনি জাহান্নাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট খারাপও নয়। তাই মানুষ পৃথিবীতে যে মদ পান করে তা থেকে তারা কিছু আনন্দ পায় ঠিকই, কিন্তু এর খারাপ দিকগুলো থেকেও তারা বাঁচতে পারে না। আর এ জন্যই মদকে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহা না ওয়া' তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا﴾

অর্থ: “মানুষ আপনাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন যে তাতে বড় পাপ এবং সামান্য কিছু উপকার রয়েছে। আর এর খারাপ দিক ভালোর চেয়ে অনেক বেশি।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)
কিন্তু জান্নাতের মদ হবে সব খারাপ দিক হতে পবিত্র।

এখন কথা হচ্ছে, জান্নাতের বাসিন্দারা খাওয়া দাওয়া করবে কেন?

ইমাম কুরতুবি বলেন,

نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع، ولا شربهم عن ظمأ، ولا تطيبهم عن نتن، وإنما هي لذات متوالية، ونعم متتابعة. وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل

অর্থ: “জান্নাতের মানুষ তাঁদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবে না, তাঁরা তৃষ্ণা মেটানোর জন্য পান করবে না। তাঁরা দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সুগন্ধি মাখবে না, তাঁরা এই সব করবে উপভোগ করার জন্য, এসব হবে তাঁদের বিলাসিতা। একজন মানুষ পৃথিবীতে যা যা ভালোবাসতো তার সবকিছুই সে জান্নাতে পাবে। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর জন্য এমন সব জিনিস লুকিয়ে রেখেছেন যা সে জানেই না।”

কেননা মহান আল্লাহ সুবাহানা হু ওয়া তা'আলা জান্নাতে হযরত আদম আ. কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾

অর্থ: “নিশ্চয়ই তোমার জন্য এ ব্যবস্থা যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও হবে না এবং বস্ত্রহীনও হবে না। আর সেখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না এবং রৌদ্রদগ্ধও হবে না।” (সূরা ত্বাহা, আয়াত ১১৮-১১৯)

একটা প্রশ্ন আসে যে কোন বোন যদি তালাকপ্রাপ্ত হোন, তাহলে জান্নাতে তিনি কার সাথে থাকবেন?

যদি স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই জান্নাতে যায়, তাঁরা একসাথে থাকবে। তাঁদের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে, তাহলে নিচে যে থাকবে তাকে উপরের স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ সুবহা না ওয়া' তা'আলা কাউকে নিচে নামিয়ে আনবেন না। তিনি তাঁর রহমত দিয়ে মানুষকে উপরের স্তরে উন্নীত করবেন। আল্লাহ সুবহা না ওয়া' তা'আলা বলেন,

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾

অর্থ: “(সে তো হচ্ছে) এক চিরস্থায়ী জান্নাত, সেখানে তাঁরা নিজেরা (যেমন) প্রবেশ করবে, (তেমনি) তাঁদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে তারাও (প্রবেশ করবে), জান্নাতের প্রতিটি দরজা দিয়ে ফেরেশতারাও তাঁদের সাথে প্রবেশ করবে।” (সূরা রাদ, আয়াত ২৩)

আল্লাহ সুবহা না ওয়া' তা'আলা আরও বলেন,

﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ﴾

অর্থ: “তাঁরা এবং তাঁদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে।” (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৫৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾

অর্থ: “তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো আনন্দের সাথে।” (সূরা যুখরুফ, আয়াত ৭০)

তো তাঁদের সবাইকে, পুরুষ ও নারী, উভয়কেই জান্নাতে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কোন স্বামী বিপত্নীক হোন আর তিনি আবার বিয়ে করেন, তখন কি হবে?

তিনি জান্নাতে গেলে তাঁর দুই স্ত্রীর সাথেই তিনি একত্র হবেন। কিন্তু যদি কোন মহিলা বেঁচে থাকেন আর তাঁর স্বামী মারা যান, এই মহিলা জান্নাতে কার সাথে থাকবেন?

একটি দুর্বল বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে, আবু দারদা রাযি. মারা যাওয়ার পর মুয়াবিয়া রাযি. উম্মে দারদাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু উম্মে দারদা বলেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘একজন নারী তাঁর সর্বশেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে একত্র হবে।’ এই বর্ণনাটি দুর্বল। কিন্তু আরও দু’টি বর্ণনায় এটি শক্তিশালী হয়ে যায়।

প্রথমত: আসমা বিনতে আবু বকর রাযি., আবু বকর সিদ্দিকের রাযি. মেয়ে। তাঁর বিবাহ হয়েছিলো যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. এর সাথে। আর যুবাইর রাযি. ছিলেন সেই দশজনের একজন, যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো।

আসমা রাযি. একদা তাঁর পিতার নিকট অভিযোগ করলেন তাঁর স্বামীর ব্যাপারে যে তাঁর স্বামী খুব কঠোর লোক।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. খুব শক্তিশালী একজন মানুষ, ও বিচক্ষণ ঘোড়সওয়ার ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীদের অন্যতম। এক যুদ্ধে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. এক শত্রুর মাথায় তাঁর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেন। সেই তলোয়ার শত্রুর পুরো দেহ ছেদ করে তাঁর ঘোড়ার পিঠের জিনকে দু টুকরো করে ফেলে।

এটা দেখে সাহাবারা বললেন, আপনার তলোয়ার তো অনেক শক্তিশালী! যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. বলেন, ‘এটা তলোয়ারের শক্তি নয়, এটি আমার বাহুর শক্তি।’

অপর এক যুদ্ধে, তাঁর সামনে যে শত্রু সেনা ছিল, তার পুরো দেহ বরমে ঢাকা ছিল, শুধুমাত্র চোখের কিছু অংশ বাদে। যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. সেই ছোট ছিদ্র দিয়ে তাঁর বর্শাটা ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু বর্শার ফলা যেহেতু মোটা, তাই সেটা ঢুকতে পারছিল না, যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. বর্শাটাকে এত জোড়ে চাপ দিলেন যে বর্শার ফলা বেঁকে গেল। তিনি এভাবে বর্শাটিকে ধরে রাখলেন যতক্ষণ না সেই শত্রু সেনার মৃত্যু হয়।

আবু বকর সিদ্দিক রাযি. সেই বর্শাটি স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে নিজের সাথে রেখে দেয়ার অনুরোধ করলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটা তাঁর কাছেই রাখলেন। আবু বকর রাযি. মারা যাওয়ার পর উমার বিন খাত্তাব রাযি. সেটি পাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং আমৃত্যু টা সাথে রাখলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর উসমান ইবনে আফফান রাযি. সেটি নিলেন। আর তাঁরও মৃত্যুর পর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. সেটি নিয়ে যান।

তো এই শক্তিশালী মানুষটি তাঁর স্ত্রীর সাথে আচরণেও একটু কঠোর ছিলেন।

তাই আসমা রাযি. তাঁর পিতার কাছে অভিযোগ করলেন। তাঁর অভিযোগ শুনে আবু বকর সিদ্দিক রাযি. বললেন,

عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَكَانَ شَدِيدًا عَلَيْهَا، فَأَتَتْ أَبَاهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ يَا بَنِيَّةُ اضْبِرِّي، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ صَالِحٌ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمْ تَزَوِّجْ بَعْدَهُ جُمَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: “হযরত ইকরামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন। আর যুবাইর রাযি. ছিলেন একটু কড়া ও কঠোর মেসাজের লোক। ফলে আসমা

রাখি, স্বীয় পিতা হযরত আবু বকর রাখি। এর কাছে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, ‘হে আমার মেয়ে! ধৈর্য ধারণ করো, কেননা কোন নারীর যদি একজন সৎ স্বামী থাকে আর তাঁর মৃত্যুর পর সে আর কাউকে বিয়ে না করে, তাহলে আল্লাহ তাঁদের দু’জনকে জান্নাতে একত্র করবেন।’ (তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনি সা’দ, হাদীস নং ১০৩৯২)

আবু বাকর সিদ্দিক রাখি। জানতেন যে তাঁর মেয়ের কষ্ট হচ্ছিল যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাখি। এর আচরণে। কিন্তু তিনি এও জানতেন যে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাখি। জান্নাতে সবচেয়ে উচ্চস্থান অধিকারীদের একজন হবেন। আর তাই তিনি চাইতেন তাঁর মেয়েও যেন সেই উচ্চাসন লাভ করতে পারে, তাই তিনি তাঁর মেয়েকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেন। এই দুনিয়াটাই তো সব না, আখিরাতটাই আসল জীবন। তাই আমি আমার প্রিয় ভাই ও বোনদের বলতে চাই যে, আপনি যদি আপনার স্বামী অথবা স্ত্রীর কোন বিষয় অপছন্দ করেন কিন্তু আপনার স্বামী/স্ত্রী যদি আল্লাহর নেক বান্দা হোন, তাহলে ধৈর্য ধরুন।

একদা উমর ইবনুল খাত্তাব রাখি। এর কাছে এক মহিলা এসে বললো, ‘হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আমার স্বামীকে চাই না।’ উমর ইবনুল খাত্তাব রাখি। বলেন, ‘সব বিয়ে প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এটা হচ্ছে একটা দায়িত্ব। একটা মুসলমান পরিবার গড়ার দায়িত্ব, মুসলমান পরিবেশে বাচ্চাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ দেয়ার দায়িত্ব। তবুও স্বামী স্ত্রীর মাঝে একটা ভাল সম্পর্ক থাকা জরুরি।

হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَتْ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. (رواه مسلم)

অর্থ: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের স্বামী-স্ত্রীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না, কেননা তোমরা যদি তাঁদের

কোন বিষয় অপছন্দ করো, তাঁদের এমন অনেক দিক আছে যা তোমরা ভালোবাসো।”

আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি আছে বায়হাকীতে আর তা হচ্ছে,

رواهالبیهقي في سننه أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة.

অর্থ: “সুনানু বায়হাকীতে বর্ণিত, হুযাইফা রাখি। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্ত্রীকে বলেন, ‘তুমি যদি পরকালে আমার স্ত্রী হতে চাও, তাহলে আমার পরে কাউকে বিয়ে করো না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে একজন নারী পরকালে তাঁর দুনিয়ার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। আর এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের তাঁর পর অন্য কারো সাথে বিবাহকে মহান আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। কেননা তারা জান্নাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী হবেন।

আরেকটি বিষয়ে আমি বলতে চাই, যা অনেকের মনে প্রশ্ন হয়ে আছে। আর তা হচ্ছে হুরুল ‘ইন এর ব্যাপারে। অনেক বোনের মনে এই প্রশ্ন আসে যে জান্নাতে তাঁদের কি হবে? পুরুষদের জন্য হুর থাকবে কিন্তু তাঁদের কি হবে?

কোন বোনের মনে হতে পারে যে জান্নাতে আমার স্বামীর এতগুলো স্ত্রী থাকবে, দুনিয়াতে তো আমি একা ছিলাম তাঁর সাথে।

প্রিয় বোনেরা আমার, শুরুতেই বলে নিই যে জান্নাতে কারো মন খারাপ করার মতো কোন বিষয় থাকবে না। কারো কখনও সেখানে মন খারাপ হবে না। আল্লাহ সুবহা না ওয়া’ তা’আলা আরও বলেন,

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾

অর্থ: “...সেখানে তাঁদের মন থেকে সব খারাপলাগা দূর করে দেয়া হবে...” (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৪৩)

তাই সেখানে কোন হিংসা থাকবে না, কোন মন্দলাগা থাকবে না, কোন ধরনের খারাপ অনুভূতির স্থানও জান্নাতে হবে না।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনি জানেন পুরুষরা কি চায়, নারীরা কি চায়। তাঁদের অন্তর যা চায় আল্লাহ তাঁদেরকে তার সবকিছু দেবেন। আল্লাহ সুবহা না ওয়া' তা'আলা জানেন যে পুরুষরা অনেক স্ত্রী চায় এবং এটাই বাস্তবতা, কেউ যদি এটা অস্বীকার করতে চায় সেটা ভুল হবে। আর আল্লাহ সুবহা না ওয়া' তা'আলা তাঁদেরকে তা দিয়ে দিবেন। জান্নাতে সব পুরুষই কমপক্ষে দুইজন স্ত্রী পাবে এবং নারীদেরও এমন অনেক বাসনা আছে। আল্লাহ সুবহা নাহ ওয়া' তা'আলা তাঁদের সব বাসনা পূরণ করবেন। আর এমন অনেক জিনিস দিবেন যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারে না। তাই মন খারাপ করার কোন কারণ নেই।

নারীরাও একের অধিক স্বামী চায় না, এটা তাঁদের প্রকৃতি। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও পুরুষ আর মহিলারা আলাদা। আল্লাহ সুবহা নাহ ওয়া' তা'আলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি জানেন আমরা কি চাই, আর জান্নাতে তিনি তা পূরণ করবেন।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ‘দুনিয়াতে আমাদের যেমন আলেমদের দরকার, তেমনি আখিরাতেও দরকার। দুনিয়াতে দরকার আমাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্য, আর জান্নাতে দরকার আল্লাহর কাছে কি চাইতে হবে তা জানার জন্য।’

আমরা কি চাই সেটাই আমরা জানি না। জান্নাতে হয়তো আমাদের আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, ‘আমরা আল্লাহর কাছে কি চাইতে পারি?’

কিন্তু আল্লাহ জানেন আমরা কি চাই। আর আল্লাহ আপনাকে তা দিবেন। তাই হতাশ হবেন না। আল্লাহ আপনার মনের আশা পূরণ করবেন।

জান্নাতে সামাজিক সম্পর্ক

কল্পনা করুন, আপনি আপনার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে জান্নাতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখছেন।

ইতোমধ্যে আমরা অনেক জায়গার বর্ণনা দিয়েছি এবং এটাও মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, যা কিছু আপনি দেখছেন সব আপনার সম্পত্তি, আপনি এখানে বেড়াতে আসেন নি বরং এ সব সম্পত্তি আপনার নিজেরই।

এখন পর্যন্ত আপনি আপনার প্রাসাদ, নদী, ঝরণা প্রভৃতি দেখেছেন। এতক্ষণ আপনি অনেক কিছু দেখলেও হয়তো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন নি। আর এখন যেহেতু আপনি সেখানে চিরস্থায়ী আবাস স্থাপন করতে চলেছেন সেহেতু এর খুঁটিনাটি আপনার চোখে পড়ছে।

সেখানকার আসবাবপত্র, বিভিন্ন সরঞ্জামাদি এমনকি গাছের পাতাগুলির প্রতি এখন আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন। সবকিছুই যে একদম নতুন, সবকিছুর মাঝেই যেন আনন্দের উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠিক যেন সদ্য জন্মলাভ করা একটি শিশুর মতো যে কিনা তার চারপাশের সব কিছুর প্রতি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, সবকিছুর মাঝে সে আকর্ষণ খুঁজে পায়।

হয়তো আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে গদির বিছানায় বসে আছেন, ইতোমধ্যেই বালিশের কাপড় ও অন্যান্য বস্তু নেড়েচেড়ে দেখে ফেলেছেন, এখন অন্যান্য সবকিছুর ওপর আপনার চোখ গিয়ে পড়ছে। আপনাকে পানীয় পরিবেশন করা হয়েছে, এখন আপনি যে পাত্রে পানীয় দেওয়া হয়েছে সেটা পর্যবেক্ষণ করছেন। আর আপনি অবাক হয়ে খেয়াল করলেন পাত্রটি সম্পূর্ণ সোনার তৈরি! খাঁটি সোনা, এমন কিছু যেটার সাথে তুলনীয় কিছু আপনি দুনিয়াতে কখনও দেখেন নি; যেন এটার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারাটাই একটা সৌভাগ্য।

পরদিন আপনাকে যে পানীয় দেওয়া হল তার পাত্রটি আবার ভিন্ন রকম, আজকের পাত্রটি সম্পূর্ণ রূপার তৈরি! তাও আবার এমন রূপা যে এটি যে রূপা এ নিয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই, যেন আপনি জানেন এটা রূপা, কিন্তু এটি স্বচ্ছ একরকম রূপা; পাত্রের এদিক থেকে ওদিক দেখতে পাচ্ছেন আপনি। কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে আল্লাহুই ভালো জানেন।

আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন,

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَيَّةٍ مِنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ﴾

অর্থ: “তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মতো পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে।” (সূরা দাহর/ইনসান, আয়াত ১৫)

সুতরাং পাত্রটি রূপার তৈরি হলেও একদম স্বচ্ছ, যা দেখে আপনি বিস্মিত হচ্ছেন, আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন। এ দেখে আপনার এক খাদেম আপনাকে বললো এর চেয়েও মনোমুগ্ধকর বস্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর তাঁরা আপনাদেরকে নিয়ে গেল দু'টি বিশেষ বাগানে যা কিনা আপনাদেরই সম্পত্তি। বিশাল দু'টি বাগান, যার একটিতে সবকিছু স্বর্ণের ও অপরটির সবকিছু রূপার তৈরি। যেমন আপনি রূপার বাগানটিতে গিয়ে দেখলেন এর গাছপালা, গাছের পাতা, সাজানো টেবিল-চেয়ার, থালা-বাসন, চামচ, সংলগ্ন প্রাসাদ সবকিছুই খাঁটি রূপার!

একইভাবে অন্য বাগানটিতে গিয়ে আপনি দেখলেন সবকিছু খাঁটি সোনার তৈরি। তখন হয়তো আপনার স্ত্রীর সাথে এগুলি নিয়ে কথা হচ্ছে, সে বলছে যে সোনার বাগানটি তার নিজের জন্য থাক, আপনি রূপারটা নিজের জন্য নিন (যেহেতু পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম)। কিন্তু এ সময় সেখানকার রক্ষী আপনাদের জানালো সবকিছুই সবার জন্য গ্রহণযোগ্য ও হালাল এবং শুধু তাই না, যে কোনো আনন্দ, উত্তেজনা ও উপভোগের বস্তু যা দেখবেন বা চাইবেন তার সবকিছুই আপনারা পাবেন ও যতখানি চেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাবেন। এটা শুধু শারীরিক সুখ বা মানসিক শান্তি না বরং দু'টির এক অপূর্ব সমন্বয় যা শুধু জান্নাতেই লাভ করা সম্ভব।

সহিহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

عن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال...وجنتان من فضة أُنِيتهما وما فيهما. وجنتان من ذهب أُنِيتهما وما فيهما.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ...জান্নাতে দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরের সকল জিনিস রৌপ্য নির্মিত হবে। আরও দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং সমুদয় জিনিস সোনার তৈরি হবে। জান্নাতী লোকেরা আদন জান্নাতে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। এ জান্নাত এবং আল্লাহর এ দিদারের মাঝখানে পরওয়ারদিগারের প্রবল প্রতাপ ও গৌরবের চাদর ভিন্ন আর কোন আড়াল থাকবে না।

জান্নাত শুধু ব্যক্তিগত উপভোগের স্থান নয় বরং জান্নাতের মানুষদের আনন্দময় জীবনের একটি বড় অংশ হচ্ছে তাদের সামাজিক জীবন। অর্থাৎ সেখানে আপনি যে শুধু আপনার স্ত্রীর সাথে বাস করছেন, তার সাথে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখছেন যতক্ষণ না দেখতে দেখতে ক্লান্তি চলে আসে তা না বরং সেখানে খুবই প্রাণ চাঞ্চল্য একটি সামাজিক জীবন বিদ্যমান। জান্নাতের বাসিন্দারা একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে, কথাবার্তা বলে, একসাথে অনেক সময় কাটায় এমনকি জান্নাতে আপনার আশেপাশে কারা বসবাস করে জান্নাতে গিয়ে আপনি চাইলে তাদের সবার পরিচয়ও জেনে নিতে ও তাদের সাথে দেখা করে আসতে পারবেন। কোনো কিছুতেই কোন বাধা থাকবে না।

আপনি চাইলে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দেখা করতে বা তার সাথে এক বছর সময় কাটিয়ে আসতে পারবেন, কে তাতে আপনাকে বাধা দিবে? কেউ না। একসাথে তাঁর সাথে

যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন, যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন।

যেমন ধরুন সীরাতে যদি আপনি একই বিষয়ে দু'টি ভিন্ন বর্ণনা পেয়ে থাকেন এবং কোন বর্ণনাটি সঠিক তা জেনে নিতে চান, আপনি তা করতে পারবেন। তাঁর সাথে যত খুশি সময় কাটিয়ে আসতে পারবেন। আপনি যেহেতু তাঁরই উম্মাহর, তিনি কেন আপনাকে সময় দিবেন না?

আপনি যদি মূসা আ. এর সাথে সময় কাটাতে চান, তাঁর সময় দুনিয়া কেমন ছিল জানতে চান, তা করতে পারবেন। যদি চান আদম আ. এর সাথে দেখা করতে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে যে আপনি যখন প্রথম মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে আসেন তখন কিভাবে সবকিছুর সাথে মানিয়ে নিয়েছিলেন, কিভাবে ধীরে ধীরে মানব সভ্যতা গড়ে তুললেন, তখন পৃথিবী কেমন ছিল, তখন কি ডাইনোসরদের দেখা যেতো ইত্যাদি; আপনি সেগুলিও জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারবেন।

(আমরা এখন জুরাসিক পার্ক বা অন্যান্য ডাইনোসরের মুভি দেখে কৌতূহলবশত প্রশ্ন করে থাকি যেমন ইসলাম এগুলির ব্যাপারে কি বলে ইত্যাদি। প্রাচীন সময়ের মুসলিমদের এসব বিষয়ে প্রশ্ন করে দেখতে পারি যে তাঁরা পৃথিবীতে এসে ডাইনোসর দেখেছিল কি না? কিংবা তাদের কোন ফসিল বা ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট ছিল কি না? সবই আমরা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারবো। এছাড়া যেহেতু সময়ের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তাই যে কোনো কিছুই জেনে চাইলে আমরা যত ইচ্ছা সময় বার করে নিতে পারবো। যে কোনো মানুষের সাথে দেখা করা, কথাবার্তা বলার জন্য যতখানি সময় আমরা চাই, তা নিতে পারবো।)

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা জান্নাতে আমাদের মাঝে সংঘটিত হবে এরকম কিছু কথোপকথন সম্বন্ধে কুরআনে বর্ণনা করেছেন। যেমন উদাহরণ হিসেবে এই আয়াতটি, মহান আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۚ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ﴾

অর্থ: “এবং আমরা তাদের অন্তরে গুঁত পেতে থাকা সমস্ত কষ্টের অনুভূতি দূর করে দিবো। তাঁরা হয়ে যাবে (একে অপরের) ভাই, একে অপরের দিকে আনন্দের সাথে মুখোমুখি হয়ে মর্যাদার আসনে আসীন হবে। সেখানে তাদের কোনো অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তাঁদেরকে সেখান থেকে কোনোদিন বেরও করে দেয়া হবে না।” (সূরা হিজর ১৫, আয়াত ৪৭-৪)

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন যে আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই মহান আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও এই ধরনের অনুভূতিগুলো দূর করে দিবেন।

দুনিয়াতে আমরা একজন আরেকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা আর জান্নাতে একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের মধ্যে একটি ব্যবধান আছে। জান্নাতে আমরা একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার মাঝে এত সুখের উপকরণ খুঁজে পাবো, কারণ আমাদের মাঝে অন্যের প্রতি কোন রকম ঘৃণা-বিদ্বেষ বা অপছন্দের মনোভাব কাজ করবে না। জান্নাতে সবাই সবাইকে ভালোবাসবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

على قلب واحد.

অর্থ: “তাদের অন্তরসমূহ হবে একজন মানুষের অন্তরের মতো।”

দুনিয়ায় এক এক মানুষের চিন্তাধারা ও মন মানসিকতা একেক রকম, কাজেই মানুষ মানুষের মনের মিল না থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে মন কষাকষি হয়ে থাকে, কিন্তু জান্নাতে তেমনটি হবে না বরং সবাই একইভাবে চিন্তা করবে, সবার অন্তর হবে একই রকম।

যে কারণে যখনই কোন ভাই তার অপর ভায়ের সাথে বা কোন বোন তার বোনের সাথে সাক্ষাৎ করবে সেটাই তাদের জন্য উৎফুল্লতার কারণ হবে, যদিও তখনও কথা-বার্তাই শুরু হয় নি। কেন? কারণ দুনিয়াতে আমরা না চাইলেও মনে অনেক রকম অনুভূতি সৃষ্টি হয় যেগুলি অনেক সময় ভালো

হয় না, যার কারণে মুসলিম হিসেবে মাঝে মাঝে নিজের মনের সাথেই আমাদের দ্বন্দ্ব করতে হয়, জান্নাতে এই ব্যাপারটা থাকবে না।

দুনিয়াতে সামাজিক প্রাণী হিসেবে আমাদের মনের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতির মূল প্রোথিত থাকে। মুসলিম হিসেবে এসবের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়। এর ভিত্তিতে একজন মুসলিমের ঈমানের দৃঢ়তা নির্ধারিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে আমরা জানি তিনি যখন শিশু ছিলেন তখন জিবরাঈল আ. এবং অন্য একজন ফেরেশতা নেমে আসেন এবং তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করে তার মধ্যে থেকে জমাটবদ্ধ কিছু রক্ত বের করে নেন এবং বলেন যে এটা তাঁর হৃদয়ে শয়তানের অংশ যা তাঁর বের করে নিচ্ছেন। যার ফলে তাঁর হৃদয়ের ওপর শয়তানের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্তর পবিত্র এবং তাঁর ওপর শয়তানের কোন প্রভাব ছিলো না।

আমাদের প্রত্যেকের সাথে একজন ‘কারীন’ আছে; কারীন অর্থ সঙ্গী। আমাদের প্রত্যেকের ওপর একজন শয়তান নিযুক্ত আছে। এই শয়তানের কাজ আমাদের বিপথগামী করা। আমরা যেখানেই যাই, আমাদের সাথে একজন শয়তান চলাফেরা করে যে আমাদের পথভ্রষ্ট করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أما أنا فأسلم قريني.

“আমার কারীন মুসলিম হয়ে গিয়েছে।”

যে কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ অন্তরের সাথে এই যুদ্ধ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। জান্নাতে আমরা এই বিপথগামী প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি পাবো।

আমরা জানি যে আমরা আমাদের ভাইদের ভালোবাসি। কিন্তু মনের ভেতরে যেন কিছু একটা এই ভালোবাসাকে ভুল প্রমাণিত করতে চায়। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর এবং আমরা একে সবসময় দূর করার চেষ্টা করি। কিন্তু জান্নাতে এসব থাকবে না, আমরা সবাইকেই অন্তর থেকে ভালোবাসবো। তাই সবার সাথে দেখামাত্রই মন খুশিতে ভরে উঠবে এবং কারো সাথে কথা বলে বিরক্তি বা একঘেয়েমিও আসবে না।

জাহান্নামীদের সাথে জান্নাতীদের পরস্পর কথোপকথন:

জান্নাতীরা জাহান্নামীদের অবস্থা দেখতে পাবে। যারা জান্নাতে যাবে পৃথিবীতে তাদের এমন কিছু সহকর্মী, সাথী বন্ধু থাকবে যারা জাহান্নামে যাবে। কারণ, তারা পরকালে বিশ্বাস করতো না। জান্নাতে বসে পৃথিবীর সেই অবিশ্বাসী সঙ্গী-সাথীদের কথা মনে পড়ে যাবে। বলবে, আমার তো অমুক বন্ধু ছিলো, কিন্তু সে পরকাল, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করতো না। তার এখন কী অবস্থা? সে এখন কোথায় আছে?

তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই জান্নাতীকে তাঁর অবিশ্বাসী বন্ধুর অবস্থা দেখাবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. يَقُولُ أَأِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ. أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَدِينُونَ. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ. فَاطَّلَعَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ. قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ. أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِينِينَ. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

অর্থ: “তখন তারা (জান্নাতীরা) একে অপরের দিকে ঘুরে তাকাবে ও প্রশ্ন করবে। তাদের মধ্যে একজন বলবে, ‘আমার একজন সঙ্গী ছিল দুনিয়ায় যে (ব্যঙ্গাত্মকভাবে) বলতো, ‘তুমি কি আসলেই তাদের মাঝে একজন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে?’ সে আরও বলতো, ‘আমরা যখন মারা যাবো এবং মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হবো, এরপর কি আমরা সত্যিই (কর্মফলস্বরূপ) পুরস্কার ও শাস্তি ভোগ করবো?’

আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর সঙ্গীকে) দেখবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে! আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো (জাহান্নামে) হাযিরকৃতদের একজন হতাম।

(জান্নাতবাসী ব্যক্তি বলবে) ‘তাহলে আমরা কি আর মরব না’? ‘আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, আর আমরা কি আযাবপ্রাপ্ত হব না’? নিশ্চয়ই এটি মহাসাফল্য!’ (সূরা সাফফাত, আয়াত ৫০-৫৭)

এ আয়াতসমূহ থেকে আমরা শিখতে পারলাম, পৃথিবীর কর্মস্থল, পড়াশুনা, যাত্রাপথ ইত্যাদি সূত্রে যে সকল সাথী-সঙ্গী আছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। যেমন এ আয়াতে আমরা দেখি জান্নাতী লোকটি বলবে, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে।

হ্যাঁ, কুরআনের কথা সত্যি। এ সকল অবিশ্বাসী মানুষের সাথে চলাফেরা ওঠা-বসা করলে তারা বিশ্বাসীদের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলে। কারণ, মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কার সাথে বন্ধুত্ব করছ, তা যাচাই করে নেবে, কারণ মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত।

এই আয়াত দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, জান্নাতীরা জাহান্নামীদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাবে যা তাদের প্রশান্তি দেবে। কারণ আল্লাহ তাদের কি হতে নিস্তার দিয়েছেন তা তারা উপলব্ধি করতে পারবে। এই লোকটি যেমন বলবে যে তার একজন সাথী দুনিয়াতে ইসলামকে কটাক্ষ করতো, পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করতো; অতঃপর সে তার পরিণতি দেখতে চাইবে এবং তাকে জাহান্নামে দেখতে পাবে।

একইভাবে দুনিয়াতে অবিশ্বাসীরা যেমন বিশ্বাসীদের দেখে হাসি-ঠাট্টা করতো, আখিরাতে জান্নাতীরা জাহান্নামীদের দেখে হাসি-ঠাট্টা করবে। আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: “উদ্যানের বাসিন্দারা আগুনের বাসিন্দাদের ডাক দিয়ে বলবে, ‘নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতি আমাদের প্রতিপালকের ওয়াদাসমূহকে

সত্য হিসেবে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদাসমূহকে সত্য হিসেবে পেয়েছ?’ তারা জবাব দিবে, ‘হ্যাঁ।’ অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে, আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের ওপর।” (সূরা আ’রাফ ৭, আয়াত ৪৪)

কুরআনে প্রাপ্ত তৃতীয় কথোপকথন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُجِرُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. هَلْ تُؤِثُّبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

অর্থ: “যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করতো। আর তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করতো। তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরতো, তখনও হাসাহাসি করে ফিরতো। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখতো, তখন বলতো, নিশ্চয়ই এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয় নি। আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। সিংহাসনে বসে, তাদেরকে অবলোকন করছে। কাফেররা যা করতো, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?” (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩, আয়াত ২৯-৩৬)

অবিশ্বাসীরা দুনিয়াতে বিশ্বাসীদের প্রতি যা কিছু করেছে তার সবকিছুর প্রতিফল তাদের দেওয়া হবে এবং মুসলিমরা সেদিন সিংহাসনে বসে কাফিরদের অবমাননাকর অবস্থা প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদেরকে উপহাস করবে।

এগুলি ছিল জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদের মাঝে সংঘটিতব্য কিছু কথোপকথন এবং অবশ্যই জান্নাতীরা জাহান্নামে যা কিছু হচ্ছে, তার সবকিছুই অবলোকন করতে পারবে, যার সাথে ইচ্ছা কথা বলতে পারবে,

এর দ্বারা আল্লাহ জান্নাতীদের যা কিছু দিয়েছেন তার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞতাবোধ করবে।

ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ড

জান্নাতে আল্লাহর প্রতি কোনো প্রকার ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ড থাকবে না, কোন নামাজ, রোজা বা যাকাত প্রদানের উপায় থাকবে না। আমাদের ওপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না, আল্লাহর ইবাদতের সবরকম প্রয়োজন তখন শেষ। ইবাদাতের শুধু একরকম মাধ্যমই তখন বিদ্যমান থাকবে, তা হল তাসবীহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা স্বীকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহিহ বুখারীর হাদীসে বলছেন,

يسبحون الله بكرة وعشيا.

অর্থ: “তাঁরা (জান্নাতীরা) আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে, সকালে ও সন্ধ্যায়।”

এই তাসবীহ সম্পর্কে আলিমগণ বলেন,

هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتعم به الأنفس وتتلذ به. يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس.

অর্থ: “এটা এমন কোন ইবাদাত না যা তাঁদের প্রতি আদেশ করা হয়েছে বরং এটা তাঁদের জন্য আনন্দ ও উৎফুল্লতা লাভের একটি মাধ্যম, তাঁরা নিজেদের প্রশান্তি লাভের জন্যই এটা করবে। তাঁরা তাসবীহ করবে যেভাবে তাঁরা এই দুনিয়াতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে।”

অর্থাৎ আল্লাহর মহিমাকীর্তন হবে তাদের কাছে নিঃশ্বাসের মতো, যা সম্পূর্ণ বিনা প্রচেষ্টায়, প্রাকৃতিকভাবে বেরিয়ে আসে। আর এটাই ইবাদতের একমাত্র মাধ্যম, যা ছাড়া অন্য সব কর্মকাণ্ডই অবকাশ যাপনের ন্যায়।

জান্নাতে একজন যা চায়, তাই পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারীর এই হাদীসট উল্লেখ করা যায় যেখানে ইরশাদ হয়েছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أأست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء.

فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আলোচনা করছিলেন সেখানে একজন গ্রাম্য বেদুঈন উপস্থিত ছিলো। তিনি বলছিলেন যে একজন মানুষ জান্নাতে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, ‘ও আল্লাহ, আমি চাষাবাদ করতে চাই!’ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁকে বলবেন, ‘তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ কি তোমার নিকট নেই?’

সে জবাব দিবে, ‘হ্যাঁ তবে আমি কৃষিকাজ করতে চাই।’

তাই সে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে বীজ বপণ করবে। চোখের পলক ফিরাবার আগেই ফসল অংকুরিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে, কর্তন করা হবে এবং পাহাড়ের মতো স্তূপীকৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, হে বনী আদম! তুমি এগুলো নিয়ে যাও। কেননা কোন কিছুই তোমার তৃপ্তি হয় না।

তখন গ্রাম্য আরব লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেখবেন সেই লোকটি কোন আনহার অথবা কুরাইশ গোত্রীয় হবে, যেহেতু তারাই কৃষিকাজ করে। আর আমরা তো কৃষিকাজ করি না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন।” (সহীহ বুখারী, কৃষিকর্ম অধ্যায়, হাদীস নং ২২২১)

কিছু মানুষ এতটাই কর্মপ্রিয় হয় যে তারা জান্নাতে গিয়েও কাজ ছাড়া থাকতে পারবে না। যেমন এই লোকটি জান্নাতে গিয়েও চাষাবাদ করতে

চাইবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে চাষাবাদ করতে দিবেন, পাহাড়সমান ফসলও দিবেন এবং আদম সন্তান অর্থাৎ মানুষের কখনো সন্তুষ্ট না হওয়ার প্রবণতাকে ইঙ্গিত করবেন। এটা শুনে বেদুঈন লোকটি অবাক হয়েছিলো। কারণ বেদুঈনরা যাযাবর জীবনযাপন করে ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। অপরপক্ষে মদীনার মানুষেরা চাষাবাদে অভ্যস্ত। একারণে তার মতে সেই লোকটি কুরাইশ বা আনসারদের মাঝে থেকে হবে। যা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেলেছিলেন।

তিরমিজী শরীফের আর এক হাদীস হতে জানা যায়,

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا انتهى الولد في الجنة كان حملة ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي
অর্থ: “জান্নাতে কেউ যদি সন্তান জন্ম দিতে চায়, তবে গর্ভাবস্থা, সন্তানের জন্ম, বেড়ে ওঠা সবই হবে তাৎক্ষণিক, ঠিক যেমন সে চায়।” (সুনানুত তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৬৩)

এই হাদীস কি বোঝায় এ ব্যাপারে আলেমদের মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে জান্নাতে যেহেতু স্বামী-স্ত্রীগণ নিজেদের উপভোগ করবে, এর মাঝে কোনরকম সন্তানধারণ ঘটবে না। তারা এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তারা যদি চায় সন্তান জন্ম দিতে তবে তাই হবে, কিন্তু তারা এটা চাইবে না।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাখ্যাটি অনেকের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে দেয়। অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন জান্নাতে এটা হবে কি না, সেটা হবে কি না, ওটা চাইলে পাওয়া যাবে কি না। উত্তরটা একই তারা চাইলেই পাবে, কিন্তু তারা চাইবে না। যেমন: কেউ (জান্নাতে নিম্ন কোন স্তরে থেকে) জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদা চেয়ে বসবে না, কেননা সে জানে অন্য কেউ এই মর্যাদার যোগ্য, সে না।

প্রত্যেকের মাঝে এমন এক কৃতজ্ঞতাবোধ কাজ করবে যে তাকে যাই দেওয়া হোক, সে সন্তুষ্ট থাকবে, এমনকি যদি (জান্নাতে) কোন নিম্নস্তরে নামিয়ে দেওয়া হতো তবুও সে তাতে খুশি ও সন্তুষ্ট থাকতো। আমরা

ইতোমধ্যেই সেই ব্যক্তির কথা বলেছি যে জান্নাতে শেষ ব্যক্তি হিসেবে প্রবেশ করবে। এক বর্ণনায় এসেছে, “আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সমগ্র দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার দশগুণ দান করবেন এবং তার সাথে তার দুই স্ত্রীর দেখা হবে। তারা তাকে বলবে, ‘প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অবশেষে তোমাকে আমাদের কাছে এনেছেন।’”

সে লোকটি তখন বলবে, ‘আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে এমন কিছু দান করেছেন যা তিনি আর কাউকে দেননি।’

সুতরাং জান্নাতের সর্বশেষ ব্যক্তিটিকেও এতো কিছু দেওয়া হবে, যার ফলে সে মনে করবে তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যদিও সে জান্নাতের নিম্নতম স্তরে আছে। ফলশ্রুতিতে সে আর কিছুই চাইবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن في الجنة سوقا.

অর্থ: “জান্নাতে একটি সুক অর্থাৎ মার্কেট বা বাজার থাকবে।”

এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা উচিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সবরকম বর্ণনা এমনভাবে দিয়েছেন যেন তা সেই সময়কার মদীনার লোকদের কাছে বোধগম্য হয়। যেমন, কোনো জায়গায় যদি ভালো কোনো কাজের প্রতিদান হিসেবে ৭০০ উটের কথা বলা হয়ে থাকে, তবে সেটা অন্য কোনো সময়ের মানুষের জন্য সমতুল্য কোন কিছু বোঝাবে। সেটা হতে পারে ৭০০ গরু -যদি সেই সময়ে বা স্থানে গরু সহজলভ্য হয়।

সেই সময়ে আরবে কবিতা, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল বাজার এলাকা। এখানে মানুষ একত্র হতো, যে কারণে সবাইকে জানানোর মতো কোনো ঘোষণা, বক্তব্য বাজারে দেওয়া হতো। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াহ এর কাজে বাজার এলাকাকে ব্যবহার করেছেন। জান্নাতেও অনুরূপ ‘সুক’ থাকবে, তবে এর উদ্দেশ্য ব্যবসা বাণিজ্য নয়, বরং এটি হবে সবার একত্র হওয়া ও কুশল বিনিময় করা। কিছুটা আমেরিকার সিটি সেন্টার বা ডাউনটাউনের মতো, যেখানে মানুষ জড়ো হয় আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠার জন্য।

জান্নাত ও জাহান্নাম ১৮০

মুসলিম শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে এমন একটি সূক বা বাজার থাকবে। জান্নাতবাসীরা সেই সূক বা মার্কেটে প্রতি জুমআর দিন একত্র হবে। এরপর উত্তরের প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে যা তাদেরকে চেহারা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা আরো বাড়িয়ে দিবে। সেখান থেকে তারা দ্বিগুণ সৌন্দর্য ও চাকচিক্য নিয়ে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে এবং ফিরে এসে তাদের পরিবারকেও উৎকৃষ্টতর অবস্থায় পাবে। তাদেরকে দেখে তাদের আপনজনরা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য আরো অনেক বেড়ে গেছে!

উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও চাকচিক্যও আরো অনেক বেড়ে গেছে!” (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম জান্নাতীরা সূকে যাওয়ার পর তাদের সবার সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে।

সুবহানাল্লাহ! জান্নাত সময়ের সাথে আরও উন্নত হয় পক্ষান্তরে জাহান্নামের আগুন সময়ের সাথে শুধু আরও ভয়াবহ হয়।

জান্নাতে সবাই নিজ নিজ পরিবারের সাথে আরাম আয়েশে সময় কাটাবে, এমন সময় একটা ডাক বা আহ্বান শুনতে পাবে। এই আহ্বান বা ডাক শুনে তারা সবাই সূকে গিয়ে একত্র হবেন। শুধু জান্নাতীগণই নয়,

জাহান্নামের অধিবাসীরাও এক জায়গায় গিয়ে একত্র হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت على هيئة كبش أملح، فيوضع في مكان بين أهل الجنة والنار ثم ينادى مناد، يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا، يقولون بلى أنه الموت، ثم ينادي نفس المناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا يقولون نعم أنه الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار،

ثم نفس المنادي يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের অঞ্চলে ফেরেশতাগণ মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে নিয়ে আসবে। জান্নাত-জাহান্নামের সবাই গলা বাড়িয়ে (অর্থাৎ অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ও মনোযোগ সহকারে দিয়ে) দেখতে থাকবে যে কি হতে চলেছে।

এমতাবস্থায় একজন ঘোষক হঠাৎ ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা কি জানো এটি কি?

তখন জান্নাতবাসীগণ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ও সজাগভাবে জবাব দিবেন যে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু।

এরপর একজন ঘোষক আবার ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসীগণ! তোমরা কি জানো এটি কি?

তখন জাহান্নামীগণ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ও সজাগভাবে জবাব দিবেন যে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু।

অতঃপর ফেরেশতাগণ জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি ছুরি দ্বারা মৃত্যুকে যবেহ করে দিবেন। এরপর তাঁরা জান্নাতবাসীদের উদ্দেশ্যে

ঘোষণা করবে, “হে জান্নাতীগণ! অনন্তকাল বেঁচে থাকো, তোমাদের মৃত্যু নেই।”

এরপর জাহান্নামবাসীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করবে, “হে জাহান্নামীগণ! অনন্তকাল বেঁচে থাকো, তোমাদের মৃত্যু নেই।” (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “এমন কোন মুহূর্ত যদি থাকে যখন অত্যাধিক আনন্দ-উত্তেজনার ফলে কেউ মারা যেতে পারে, তবে জান্নাতের মানুষদের জন্য এটা হবে সেই মুহূর্ত এবং এমন কোন মুহূর্ত যদি থাকে যখন অত্যাধিক দুঃখ-হতাশার ফলে কেউ মারা যেতে বসে তবে জাহান্নামের মানুষদের জন্য এটা হবে সেই মুহূর্ত।”

এটা জান্নাতীদের জন্য সর্বোত্তম এবং জাহান্নামীদের জন্য নিকৃষ্টতম মুহূর্ত হবে। কেননা এর মাধ্যমে যেমন জান্নাতবাসীরা উপলব্ধি করবে তাদের এই আনন্দের জীবনের আর শেষ নেই, ঠিক তেমন জাহান্নামীরা বুঝতে পারবে এই কষ্টের মাঝে তাদেরও আর কোন আশা নেই।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾

অর্থ: “তারা সেখানে আর মৃত্যু আন্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাঁদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।” (সূরা দুখান ৪৪, আয়াত ৫৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾

অর্থ: “আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও আর স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।” (সূরা কাহফ ১৮, আয়াত ১০৮)

কোন নতুন জায়গায় স্থায়ীভাবে আসার পরও যেমন সবকিছুর সাথে পরিচিত হবার পূর্বে আমরা সবকিছুর সাথে অভ্যস্ত হতে পারি না, জান্নাতে আসার পর জান্নাতবাসীরাও শুরুতে সবকিছুর সাথে পরিচিত হবার জন্য

কিছু সময় নিবে। অতঃপর যখন তাঁরা তাদের প্রাপ্য বুঝে নিবে এবং পুনরায় মৃত্যুরও আর কোনো ভয় থাকবে না। এ সময় জান্নাতবাসীরা শেষবারের মতো দু'আ করবে। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأٰخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

অর্থ: “আর সেখানে তাঁদের প্রার্থনা হবে ‘পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ’। আর শুভেচ্ছা হলো সালাম। আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে, ‘সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক মহান আল্লাহর জন্য’ বলে।” (সূরা ইউনুস ১০, আয়াত ১০)

অর্থাৎ শেষ যে কথাটা তাঁরা বলবে তা হল, “আলহামদুলিল্লাহ”- সকল প্রশংসা আল্লাহর।

তাঁরা মনে করবে তাঁরা সবকিছু ইতোমধ্যে পেয়ে গিয়েছে। প্রতিদানস্বরূপ এতো কিছু তাঁরা জান্নাতে লাভ করবে যে তাঁদের মনে হবে এর চেয়ে বেশি আর কিছু হতেই পারে না। কিন্তু না! একটা চমক তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى

يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير

كله في يدك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب،

وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من

ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟

فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً. متفق عليه.

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বলবেন: হে জান্নাতবাসীগণ! তাঁরা বলবে, উপস্থিত হে প্রভু! সৌভাগ্য ও কল্যাণ তো আপনারই হাতে।

তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না? আপনি আমাদের এমন সব নেয়ামত ও সুখ-শান্তি দিয়েছেন যা কখনো অন্য কাউকে দেন নি।

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে উত্তম কোন কিছু দিবো?

তখন তাঁরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের যা দিয়েছেন তার চেয়ে আবার উত্তম কোন জিনিস কি হতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ থেকে আমার সন্তুষ্টি তোমাদের ওপর স্থায়ী হয়ে গেলো। আর কোনো দিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টি হবো না।” (বুখারী ও মুসলিম)

এটা হবে এমন এক মুহূর্ত যখন জান্নাতবাসীদের মানসিক সুখ, আনন্দ প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। কারণ তাঁরা জানতে পারবে যে তাঁরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে। তাঁদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরা আল্লাহকে তাঁদের কাজের মাধ্যমে খুশি করেছে। তাঁদের জন্য এর চেয়ে আনন্দদায়ক আর কি হতে পারে?

আমরা দুনিয়াতে যখন কাউকে ভালোবাসি তখন তার প্রতিটি বিষয়ে আমরা সচেতন থাকি। প্রতিদানে যখন জানতে পারি যে, যাকে আমরা ভালোবাসি সে আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট, তখন আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। জান্নাতেও যখন আমরা জানতে পারবো যে আল্লাহ আমাদের আচরণে সন্তুষ্ট তখন আমাদের আনন্দের মাত্রা এতটাই বেশি হবে, যতোটা জান্নাতেও কখনো আমরা পাই নি।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.

অর্থ: হযরত সুহাইব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যখন জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি এমন কিছু চাও যে তোমাদেরকে আমি আরো কিছু বাড়িয়ে দেই?

তাঁরা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল করেন নি?

আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করান নি?

আপনি কি আমাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন নি?

(অর্থাৎ তারা বলতে চাইবে যে সবই তো আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন।

এখন আর নতুন কি জিনিস আমরা চাইতে পারি?)

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেহারা থেকে পর্দা উঠিয়ে তাঁদের জন্য নিজ চেহারাকে উন্মুক্ত করবেন। তখন তাঁদের অনুভূতি হবে আমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তাঁর চেয়ে আল্লাহ তা'আলার এ দর্শনই সর্বাধিক প্রিয়।” (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান, হাদীস নং ২৬৬)

এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ বাণীটি তিলাওয়াত করেন,

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

অর্থ: “আর যারা ভালো কাজ করে তাঁদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরো বেশী (তা হলো আল্লাহকে সরাসরি দেখা)। আর কখনোই তাদের চেহারা বিষাদ, লাঞ্ছনা বা দুচ্ছিত্তার আঁধারে ঢেকে যাবে না। তাঁরা হলো জান্নাতের অধিবাসীগণ। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।” (সূরা ইউনুস, আয়াত ২৬)

আল্লাহর চেহারা, যা কিনা সকল সৃষ্টির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আছে এবং কাউকে এর দর্শন দেওয়া হয় নি, জান্নাতবাসীরা তা দেখতে পারে। অন্যদিকে জাহান্নামীদের জন্য যেটা সবচেয়ে বড় বঞ্চনা হবে তা হলো তাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলাকে দেখতে না পাওয়া। মূসা আ. এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছিলেন। একজন মানুষ হিসেবে সবসময় বেশি বেশি চাওয়ার কারণে মূসা আ. বললেন, “ও আল্লাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাই।”

আল্লাহ বললেন, “ও মূসা, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঐ পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখো। যদি সেটা নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, আমি নিজেকে (নিজের চেহারাকে) তোমার কাছে প্রকাশ করবো।” এরপর আল্লাহ নিজের একটি নূরকে সেই পাহাড়ের কাছে প্রকাশ করলেন। এতে পাহাড় ফেটে চৌচির হয়ে গেলো এবং ধূলায় মিশে গেলো। মূসা আ. পাহাড়ের এই অবস্থা দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন, না জানি তাঁর কি অবস্থা হতো যদি তিনি আল্লাহকে দেখতে পেতেন!

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহর নূরের রূপ-মহিমা সহ্য ও উপলব্ধি করতে পারার মতো ক্ষমতা দুনিয়াতে আমাদের দেওয়া হয় নি। কিন্তু আমরা জান্নাতে এই ক্ষমতা পাবো ইনশাআল্লাহ। কারণ দুনিয়ার সকল সৃষ্টির সক্ষমতা এক রকম আর পরকালের বা জান্নাত এবং জাহান্নামের অধিবাসীদের সক্ষমতা হবে অন্যরকম।

জান্নাতের নারীদের সৃষ্টি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,
﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. غُرُبًا أَتْرَابًا. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾
অর্থ: “নিশ্চয়ই আমি হূরদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষভাবে। অতঃপর তাদেরকে বানিয়েছি কুমারী। সোহাগিনী ও সমবয়সী। ডানদিকের লোকদের জন্য।” (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬, আয়াত ৩৪-৩৭)
অন্যত্র সৃষ্টির নিপুণতা ও ভিন্নতা সম্পর্কে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

অর্থ: “এরপর আমি সৃষ্টি করেছি এক নতুন অবয়ব। পবিত্র সেই মহান আল্লাহ, তিনি কতই না উত্তম ও সুন্দর সৃষ্টিকর্তা।” (সূরা মু'মিনুন, আয়াত ১৪)

এই আয়াতে ‘খাক্কান আখ্বার’ অর্থাৎ ‘ভিন্ন গঠন’ বলে নানাবিদ গঠনে সৃষ্টি করার আল্লাহর সক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। জান্নাতে আমাদের গঠন ও অবয়ব আরও শক্তিশালী, উন্নত হবে যেন আমরা জান্নাত উপভোগ করতে পারি। জান্নাতে এতো বেশি সুখ ও ভোগের উপকরণ থাকবে যা সাধারণ বা আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেহের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব না।

রাসূলুল্লাহ যেমন বলেছেন যে, জান্নাতে একজন মানুষের শক্তি দুনিয়ার একশত মানুষের সমান থাকবে। আর আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি জান্নাতের একজন মানুষের তুলনায় দুনিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী একজন মানুষ হবে একেবারেই দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির ন্যায়।

একজন জান্নাতী ব্যক্তির জন্য এটা অনেক বড় একটা মর্যাদা এবং তাঁরা যে আল্লাহর চেহারা দেখতে পাবেন এটা তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা।

জান্নাতের নিম্নতর স্তরগুলির বাসিন্দারা আল্লাহকে সপ্তাহে একবার দেখতে পাবেন এবং এটা হবে জুম'আর দিন, সালাতুল জুম'আ যে সময়টায় হতো সেই সময়। জুম'আ একটি বিশেষ দিন। এটা সপ্তাহের সেরা একটি দিন, যেটা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাতের জন্য উপহার স্বরূপ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “পূর্ববর্তী উম্মতগুলি এটিকে ভুলভাবে গ্রহণ করেছে; ইহুদীগণ শনিবার এবং খ্রিস্টানরা রবিবার। কিন্তু আল্লাহ এই দিনটি আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছেন এবং আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।”

গুজরার হচ্ছে এমন একটা দিন যেদিন আল্লাহ আদম আ. কে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এটা সেই দিন যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে।

উল্লেখিত আছে যে, জান্নাতে এই জুম'আর দিনে যেখানে সবাই একত্র হবে, সেখানে যে কেউ এসে ঢুকে যেতে পারবে না, বরং প্রত্যেকের আসন

সংরক্ষিত থাকবে। আপনার যেখানে বসবার কথা, ফেরেশতাগণ সসম্মানে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে। আপনি সেখানে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করবেন এবং আল্লাহ একসময় আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হবেন। কিন্তু এখন আপনি সালাতুল জুম'আয় ইমাম-এর যতো নিকটে থাকবেন, সেদিন আপনার আসন আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার ততো নিকটবর্তী হবে।

অর্থাৎ জুমার সালাতের জন্য আপনি যতো আগে পৌঁছাবেন, এই দিনে আপনি আল্লাহর ততো নিকটে যেতে পারবেন। এখানে আল্লাহর সাথে আপনার কথোপকথন হবে। অতঃপর আল্লাহ আপনাদের সকলকে আপনাদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আপনি আর কিছু চান কি না এ সম্পর্কে জানতে চাইবেন। সবাই তাঁদের নিজ নিজ ইচ্ছার কথা আল্লাহ তা'আলাকে জানাবেন এবং সবশেষে সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। এটা ছিল জান্নাতের নিম্নস্তরের বাসিন্দাদের জন্য। উচ্চস্তরের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে যে তাঁরা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার সাথে দিনে দুই বার দেখা করতে পারবেন।

বিবিধ বিষয়

জান্নাতে আমাদের সফর মোটামুটি এখানেই শেষ তবে ছোটখাটো কিছু বিষয় এখনো বাকি আছে। জান্নাতের মানুষদের সম্পর্কে এবং জান্নাত ও দুনিয়ার কিছু তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। জাহান্নাম থেকে এসে জান্নাতে পরে যারা প্রবেশ করবে তাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفح، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “কিছু মানুষ তাদের কৃত গুনাহের কারণে

আযাব ভোগ করবে এবং সেজন্য জাহান্নামের আগুনে তারা ঝলসে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত ও দয়ায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে (জান্নাতের বাসিন্দারা) সম্বোধন করা হবে ‘আল জাহান্নামিয়্যিন’ (জাহান্নামী) বলে”। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৫৯)

সুতরাং জাহান্নাম থেকে জান্নাতে গমনকারী ব্যক্তির জান্নাতে যাবার সময় তাদের চামড়ার রঙ পরিবর্তিত হবে জাহান্নামের আগুনে পোড়ার কারণে এবং জান্নাতের মানুষেরা তাদের দেখে চিনতে পারবে এবং জাহান্নামী বলে সম্বোধন করবে।

এটা আমাদের কাছে শুনতে কেমন যেনো অপমানজনক বা বৈষম্যমূলক মনে হতে পারে কিন্তু না, ব্যাপারটি আসলে তেমন কিছু নয়। জান্নাতে কোনো প্রকার বৈষম্য থাকবে না। এটা তাদেরকে বলা হবে পরিচয় প্রকাশ হিসেবে। জান্নাতে কোনোপ্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা কোনোরকম অধিকার হরণের মতো দৃশ্যও দেখতে হবে না। অন্যন্য সবাই যা ভোগ করছে, তারাও তেমনই ভোগ করতে পারবে।

আমরা আমাদের সহজে ক্ষমা করতে না পারার মানবীয় প্রবৃত্তির কারণে আসলে এমনটা চিন্তা করতে পারি যে, তারা হয়তো স্বাভাবিক অধিকার হতে কিছুটা হলেও বঞ্চিত হচ্ছে। এটা মানুষ হিসেবে আমাদের বৈশিষ্ট্য। কেউ আমাদের প্রতি কোন ভুল করলে আমরা সেটা মনে রাখি; সে ব্যক্তি এ ব্যাপারে তওবা করে ফেললেও। ১০ বছর চলে যাক না কেন, অন্য সবকিছু ভুলে গেলেও এই জিনিসগুলি মনে রাখি আমরা। সে ব্যক্তিটি অনুতপ্ত হয়ে পরে এ জিনিসগুলি ভুলে যেতে চাইলেও আমরা তাদের অতীতকে টেনে আনি।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। এই লোকগুলিকে আল্লাহ তা'আলা যদিও জাহান্নামে শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু যেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অতীতের দেয়া-নেয়া চুকে যাবে। আল্লাহ তাঁদের ভালোবাসবেন। আল্লাহ তাঁদেরকে নিয়ে সন্তুষ্ট ও খুশি থাকবেন। এছাড়া আল্লাহ এই লোকগুলিকেও সেরকম ক্ষমাশীল করে তুলবেন। কারণ আমি যদি পাপ করে থাকি, আমি সেটা জেনে থাকবো।

আল্লাহ যদি ক্ষমাশীল না হতেন, আমি জান্নাতে আসতে পারতাম না এটাও আমি জানবো। সুতরাং আমার নিজের মাঝেও সেইরূপ ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটবে। যার কারণে আমাকে যদি জাহান্নামী বলে ডাকা হয়, তবে তা অপমান হবে না, বরং তা হবে আমাদেরকে চেনার উপায়, কোনোভাবেই তা তুচ্ছকারী মন্তব্য না। কেননা জান্নাতে আমরা সবাই সমান। আমরা সবাই মানুষ, সবাই কিছু না কিছু পাপ করেছি, কেউ কম কেউ বা বেশি এবং সবশেষে সবাই জান্নাতে প্রবেশ করতে পেরেছি।

এসম্পর্কে মুসলিম শরীফে একটি সুন্দর হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا ، فَانْهَم لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَخْيَوْنَ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ بِخَطَايَاهُمْ ، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا ، أُذِنَ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ، فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ ، تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ .

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা তারাই, যারা এর দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত এবং তারা সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যারা নিজেদের অপরাধের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দিবেন যে তারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে চারকোল বা কয়লার মতো হয়ে যাবে। এরপর অতঃপর তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। এরপর তাদেরকে পৃথকভাবে দলে দলে আনা হবে এবং জান্নাতের নহরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! এদের ওপর পানি ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসীরা! এদের ওপর পানি ছেড়ে দেয়া হবে। তারপর তারা এমনভাবে তরতাজা ঘাসের মতো সজীব হয়ে বর্ষণ করো। অতঃপর তারা এমনভাবে তরতাজা ঘাসের মতো সজীব হয়ে উঠবে যেভাবে প্রবহমান স্রোতের ধারে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

(প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই বর্ণনাটি দিচ্ছিলেন) তখন সেখানে উপস্থিত একজন বলেন, তখন মনে হচ্ছিলো যেনো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলবেষ্টিত কোন অঞ্চলে থেকেছেন ” (সহীহ মুসলিম। সুনানু ইবনু মাযা, হাদীস নং ৪৩০৭)

সুতরাং এগুলো হচ্ছে সেই বিশ্বাসীগণ যারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে পতিত হবে এবং তারা কতো তাড়াতাড়ি তাদের শাস্তি শেষ হয় এর ভিত্তিতে দলে দলে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এসে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এছাড়া তারা কাঠকয়লার টুকরোর মতো হয়ে বেরিয়ে আসবে, তারা আগুনে এতোটাই পুড়বে যে কয়লার টুকরা ছাড়া কিছু বাকি থাকবে না। এরপর তাদেরকে জান্নাতের নদীতে এনে ফেলা হবে এবং জান্নাতের বাসিন্দাদের বলা হবে তাদের ওপর পানি ঢেলে দিতে।

তারা তাই করবে, অর্থাৎ তারা তাদের ভাইদের সাহায্য করবে। এতে তারা বেড়ে উঠবে যেমনভাবে নদীর পানির সংস্পর্শে পলিমাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই বর্ণনাটি দিচ্ছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত একজন বলেন, তখন মনে হচ্ছিলো যেনো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলবেষ্টিত কোন অঞ্চলে থেকেছেন। কারণ মক্কায় সবুজ গাছপালা, নদী ইত্যাদির কোনো অস্তিত্ব ছিল না, ফলে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভের কোন উপায় ছিল না তাঁর জন্য। তাই লোকটি মনে করেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো মক্কার বাইরে কোথাও থেকে অভ্যস্ত ছিলেন, না হলে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করার কথা না। আর সত্যি বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই অভিজ্ঞতা আসলেও ছিল, কেননা তিনি একসময় একজন রাখাল বালক ছিলেন এবং ব্যবসার কাজে বিভিন্ন স্থানে গমন করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও ঈমানদারগণ সুপারিশ করবেন। সবার সুপারিশ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, এবার আমার সুপারিশ বাকী আছে। তিনি জাহান্নাম থেকে অগ্নিদগ্ধ এক মুষ্ঠিকে বের করে

আনবেন। তাদের জান্নাতের সম্মুখে একটি নদীতে ছেড়ে দিবেন। সেই নদীটির নাম **মাউল হায়াত** (জীবন নদী) সেখানে তারা নতুনভাবে গঠিত হবে যেমনভাবে নতুন পলি পেয়ে উদ্ভিদ অংকুরিত হয়। যেমনটি আমরা দেখে থাকি যে রোদ লাগা বৃক্ষটি সবুজ হয় আর রোদের আড়ালে থাকা বৃক্ষটি সাদা হয়ে যায়। তারা এ নদী থেকে বের হয়ে আসবে হীরার মতো উজ্জ্বল হয়ে। তাদের গলদেশে সীলমোহর করে দেয়া হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতবাসীরা বলবে, এরা হলো দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বা আল্লাহর পক্ষ হতে আযাদকৃত লোক। এরা কোন কল্যাণ ও পুন্যময় কাজ না করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

এ বিষয়টি সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে আরেকটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে,
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحِمَهُ ، مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السَّجُودِ ، تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ السَّجُودِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السَّجُودِ ، فَيَخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا ، فَيَصُبُّ عَلَيْهِمْ مَاءَ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبِتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبِتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিবেন তাঁদেরকে বের করে আনতে যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করে নি, যাদের প্রতি আল্লাহ করুণা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যারা বলে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তাদেরকে চেনা যাবে তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন দেখে। কেননা, সেই সকল আদম সন্তানদের চেহারার সিজদার অংশ ছাড়া বাকি সকল কিছুই আগুনে ইতোমধ্যে পুড়ে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহ আগুনের ওপর সিজদার

চিহ্নের অংশ খেয়ে ফেলা বা পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলা হারাম করে দেয়ার কারণে কেবলমাত্র তাই বাকি থাকবে। এরপর তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হবে এমন অবস্থায় যে তারা পুড়ে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের উপর ‘মাউল হায়াত’ বা জীবন সঞ্চারক জান্নাতী পানি প্রবাহিত করা হবে। এতে তাঁরা বেড়ে উঠবে যেমনভাবে নদীর পানির সংস্পর্শে পলিমাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৭। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২)

আরো একটি হাদীস এখানে উল্লেখ্য, যে হাদীসটি রয়েছে সহীহ মুসলিমে, আবু সাঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক উম্মত যারা যে জিনিসের ইবাদত বা পূজা করতে তারা সে জিনিসের অনুগমন করো।

ফলে মুশরিকদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। যারা আল্লাহ ছাড়া মূর্তি ও মূর্তিপূজার বেদীতে উপাসনা করতো, তাদের সবাইকে দোষখে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। অবশেষে যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতো, তারা গুনাহগার বা নেককার যাই হোক না কেন, তাঁরাই অবশিষ্ট থাকবে। আর তাঁদের সাথে আহলে কিতাবীদের কিছু লোক থাকবে।

অতঃপর ইয়াহুদীদের ডাকা হবে, তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা দুনিয়াতে কার ইবাদত করত?

তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উজাইর এর ইবাদত করতাম।

তখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা জঘন্যতম মিথ্যা কথা বলেছো। কেননা, আল্লাহর তো সন্তান বা স্ত্রী বলে কিছু নেই।

এবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, এখন তোমরা কি চাও?

তারা বলবে আমরা পিপাসার্ত, হে প্রভু! আপনি আমাদের পানি পান করান।

অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, যাও। ওখানে গিয়ে পান পান করো। এরপর তাদেরকে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

জাহান্নাম দেখে তাদের কাছে মরীচিকার মতো মনে হবে। আগুনের লেলিহান শিখা পানির মতো ঢেউ খেলতে থাকছে মনে হবে। মনে হবে একটি যেনো অপরটিকে গ্রাস করে ফেলছে। এরপর তারা পানির আশায় জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পরে যাবে।

এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে নাসারা বা খৃষ্টানদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিসের ইবাদত করত?

তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র ঈসা মসীহ এর ইবাদত করতাম।

তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, কেননা আল্লাহর কোনো স্ত্রী বা পুত্র নেই। তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা এখন কি চাও?

তারা বলবে,

তারা বলবে আমরা পিপাসার্ত, হে প্রভু! আপনি আমাদের পানি পান করান।

অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হবে, যাও। ওখানে গিয়ে পান পান করো। এরপর তাদেরকে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

জাহান্নাম দেখে তাদের কাছে মরীচিকার মতো মনে হবে। আগুনের লেলিহান শিখা পানির মতো ঢেউ খেলছে মনে হবে। মনে হবে একটি যেনো অপরটিকে গ্রাস করে ফেলছে। এরপর তারা পানির আশায় জাহান্নামের আগুনের মধ্যে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার ইবাদতকারী ব্যক্তিরা। তাদের মধ্যে নেককার বান্দারাও থাকবে, বদকারও থাকবে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা তাদের কাছে পরিচিত চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলবেন, তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছো? তোমাদের প্রত্যেকে যে যার ইবাদত করত সে তার সাথে গিয়ে মিলে যাও।

তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! দুনিয়াতে আমরা তাদের থেকে আলাদা ছিলাম। দরিদ্র, নিঃস্ব ছিলাম, কিন্তু তবুও তাদেরকে অনুসরণ করি নি।

তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব।

তখন তারা বলবে, 'নাউযুবিল্লাহি মিনকা'। আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। 'নাউযুবিল্লাহি মিনকা' এটা দুইবার অথবা তিনবার তারা বলবে। তাদের কেউ কেউ ফিরে যেতেও উদ্যত হবে। কারণ এই পরীক্ষাটি অনেক কঠিন হবে।

এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, তোমাদের কাছে কি কোনো পরিচয়ের চিহ্ন আছে যা দেখে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে?

তখন তারা বলবে, হ্যাঁ।

তখন মহান আল্লাহর পায়ের নিচের অংশ খুলে যাবে। তখন সেই সকল লোক যারা দুনিয়াতে স্বেচ্ছায়, আন্তরিকতার সাথে নামাজ আদায় করতো, মহান আল্লাহকে সিজদা দিতো তাদেরকে সিজদা করার অনুমতি দেয়া হবে। সাথে সাথে তখন সবাই সিজদায় পড়ে যাবে, কেউই আর অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু দুনিয়াতে যারা লোক দেখানোর জন্য বা নিফাকের সাথে নামাজ পড়তো বা সিজদা করতো তারা সিজদা করতে চাইলে তাদের মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে তক্তার মতো হয়ে যাবে, ফলে তারা উল্টে পেছন দিকে পড়ে যাবে। অনেক চেষ্টা করলেও সিজদা করতে পারবে না।

অতঃপর সিজদায় অবনত লোক মাথা তুলে প্রথমবার মহান আল্লাহকে যেই আকৃতিতে দেখেছিলো সেই আকৃতিতেই আবার দেখতে পাবে।

তিনি বলবেন, আমি তোমাদের রব।

তারাও বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব।

তারপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে এবং সুপারিশ করারও অনুমতি প্রদান করা হবে। তখন সকলের মুখ থেকে একটি বাক্য উচ্চারিত হতে থাকবে তা হলো, *নাফসি নাফসি*। হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো।

জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পুলসিরাত কি জিনিস?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা হচ্ছে মারাত্মক পিচ্ছিল একটি পথ। যার ওপর লোহার আঙটা এবং বড় বড় কাঁটা থাকবে। যা দেখতে নজদ এলাকার সা'দান নামক কাঁটার মতো। মুমিনগণ এই পুলের ওপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিদ্যুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ উড়ন্ত পাখির গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে,

কেউ উটের গতিতে পার হয়ে যাবে। কেউ কোনো মতে সহী সালামতে পার হয়ে যাবে। আবার কেউ ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে এই পথ অতিক্রম করবে। কোনো কোনো হতভাগ্য এই পথ পার হতে না পেরে নিচে আগুনে পড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মুমিনরা জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে যাবে।

যেই সকল মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে যাবেন তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, সেই মহান সন্তার কসম! যার হাতে আমার জান! তোমাদের কেউ তার নিজ অধিকার আদায়ে যতোখানি অনমনীয় হও, ততোখানি কঠোর হবে কিয়ামতের দিন মুমিনরা আল্লাহর কাছে, তাদের সেই সকল ভাইদের মুক্তির জন্য যারা জাহান্নামে চলে গেছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! তারা আমাদের সাথে সিয়াম পালন করতো, সালাত আদায় করতো, হজ্জ করতো। আপনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।

তখন তাদেরকে বলা হবে, যাও। তোমরা যাদেরকে চেনো, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। অতঃপর জাহান্নামের আগুন তাদের ওপর হারাম হয়ে যাবে। তাদের বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা হবে। আগুন তাদের কারো পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারো পায়ের নলী পর্যন্ত জ্বালিয়ে ফেলবে। এরপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এখন আর এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই, যাদেরকে বের করার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন, আবার যাও। যাদের অন্তরে এক দিনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাদেরকে বের করে আনো। এভাবে তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে আসবে। এরপর তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এখন আর এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই, যাদেরকে বের করার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন, আবার যাও। যাদের অন্তরে অর্ধেক দিনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাদেরকেও বের করে আনো। এভাবে তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে নিয়ে আসবে।

এরপর তারা ফিরে আসবে এবং বলবেন, হে আমাদের প্রভু! আপনি যাদেরকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন, এখন আর এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন, তোমরা পুনরায় যাও এবং যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসো।

এভাবে তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে নিয়ে আসবে এবং বলবেন, হে আমাদের রব! সামান্য পরিমাণ ঈমানের অধিকারী আর একজন লোককেও আমরা জাহান্নামে অবশিষ্ট রেখে আসি নি।

হাদীসের বর্ণনাকারী আবু সায়ীদ রাযি. বলেন, যদি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস না করো তবে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটি পড়ে দেখ,
 ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

أَجْرًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সংকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।” (সূরা নিসা, আয়াত ৪০)

উপরোক্ত দীর্ঘ হাদীস থেকে আমরা সালাত বা নামাজ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে পারলাম। এর দ্বারা বোঝা গেলো যে যদি কোনো মুসলিম, অনেক গুনাহ করে কিন্তু নামাজ পড়ে তাহলে এই নামাজের চিহ্নের কারণে একদিন সে জান্নাতে যাবে।

সুতরাং যাদের অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান থাকবে তাঁদেরকে একসময় জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ফেরেশতাগণ তাদের কিভাবে চিনবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে থাকেন যে, “ফেরেশতাগণ তাঁদের চিনতে পারবেন তাঁদের সিজদার চিহ্ন দ্বারা। কারণ জাহান্নামের আগুন আদম সন্তানের সবকিছু গ্রাস করে ফেলবে, শুধু সিজদার চিহ্নগুলি ব্যতীত।”

সুতরাং জাহান্নামের আগুন সিঁজদার স্থানগুলো ব্যতীত সবকিছু পুড়িয়ে ফেলবে। এখানে একটি বিশেষ ইঙ্গিত আছে। কেউ যদি সালাত না আদায় করে, তার শরীরে যদি সিঁজদার কোনো চিহ্ন না থাকে, ফেরেশতারা কি করে তাকে জাহান্নামের আগুনের মাঝে খুঁজে বের করবে? সুতরাং সালাত খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

এখানে যেমন উল্লেখ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে পারবে, কিন্তু এটাও প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ জাহান্নামের আগুনকে নির্দেশ দিয়েছেন সিঁজদার চিহ্নবিশিষ্ট স্থানগুলিকে অক্ষত রাখতে।

অতঃপর জাহান্নামে আজাব ভোগ করা এই লোকগুলিকে বের করে আনা হবে, তাঁদের ওপর জান্নাতের পানি ঢেলে দেওয়া হবে এবং তাঁরা অঙ্কুরিত বীজের মতো বিকশিত হবে।

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করবো আমাদের সরাসরি জান্নাতে দাখিল করতে, জাহান্নামের আগুন এক মুহূর্ত সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই।

আমরা যদি এই দুনিয়ার আগুনে এক মুহূর্ত নিজের আঙুল না রাখতে পারি, তাহলে কিভাবে সেই জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনে আমরা বছরের পর বছর সারা শরীর রাখতে পারবো?

আমরা ইতোমধ্যেই জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধি ও জাহান্নামের কঠোর শাস্তির কথা জেনেছি। এতো কিছু জানার পরও যদি কেউ তার যা করার কথা তা না করে, তাহলে তাকে আর কি বলার থাকে?

যেমন জাহান্নামের বাসিন্দারা বলবে,

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

অর্থ: “জাহান্নামীগণ আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।” (সূরা মুলক, আয়াত ১০)

“হায়! আমাদের যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি থাকতো, আমরা এখানে আসতাম না।”

মুসলিম হিসেবে আল্লাহ আমাদের কাছে সত্যটা উন্মোচিত করেছেন। আমরা যদি সত্যটা জেনেও চুপ থাকি, সেই মোতাবেক কাজ না করি, এর পরিণাম তো আরও ভয়াবহ হবে!

কেন মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে?

কারণ তারা সত্যটা জানে, কুফরারদের চেয়েও বেশি জানে, কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় এর বিপরীতে চলার সিদ্ধান্ত নেয়।

দেখুন ব্যাপারটা যখন এরকম দাঁড়ায় যে আমি অন্তকাল বেঁচে থাকবো, আমার মধ্যে কোনো রকম দুঃখ, কষ্ট, হতাশা থাকবে না, যা চাইবো তাই পাবো, এই দুনিয়ার সকল প্রকার আনন্দ-উত্তেজনা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, যেন এগুলো কিছুই না। তাই আসুন আমরা সময় থাকতে সচেতন হই, জেগে উঠি।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যখন জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন তখন তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তা পরিদর্শন করতে পাঠালেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জান্নাত এবং জাহান্নাম কেমন দেখতে গেলেন। যখন তিনি জান্নাতের বিভিন্ন সামগ্রী এবং নিয়ামত আনন্দ বিলাস দেখে এলেন তখন তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কাছে রিপোর্ট করলেন, ‘আপনার ইজ্জতের কসম! যে কেউ জান্নাতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে শুনবে, সেই তাতে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করবে’

অর্থাৎ তিনি যেন বললেন, “ইয়া আল্লাহ! আমি বুঝতে পারছি না কি করে একজন এই জান্নাত সম্পর্কে জানবে, অথচ এখানে আসতে হলে যা কিছু করা লাগে তা করবে না।”

আবার যখন তিনি জাহান্নাম দেখতে গেলেন, জাহান্নামের শাস্তি, কষ্ট ভয়াবহতা দেখে এসে তিনি রিপোর্ট করলেন, ‘আপনার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এর বিবরণ শুনবে, সে এতে প্রবেশ করবে না’

অর্থাৎ তিনি যেন বললেন, “ইয়া আল্লাহ! আমি বুঝতে পারছি না কি করে একজন মানুষ জাহান্নাম সম্পর্কে জানবে, অথচ এটা থেকে দূরে থাকতে হলে যা কিছু করা লাগে তা করবে না।”

জিবরাঈল আ. বোঝাতে পারছিলেন না, কিভাবে একজন মানুষ জান্নাতের ভোগ বিলাস আর পুরস্কারের কথা জেনেও তা অর্জনের চেষ্টা না করে বসে থাকতে পারে!

এতো পুরস্কারের কথা জেনেও কিভাবে একজন মানুষ জাহান্নামী হবে, এটা তাঁর বোঝে আসছিলো না!

কিভাবে একজন মানুষ জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা জানা সত্ত্বেও তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে না, অলস বসে থাকবে তিনি বোঝতে পারছিলেন না।

আমাদের অবস্থা মিলিয়ে দেখুন, আমরা কত সহজেই এ বিষয়গুলিকে অবজ্ঞা করি। আমরা জান্নাতের কথা জানি, কিন্তু তা পাবার প্রচেষ্টা করি না। আমরা জাহান্নামের কথা জানি কিন্তু তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করি না।

আমরা জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং এতে একটি সংক্ষিপ্ত সফর নিয়েও কথা বলেছি। যেখানে আমরা এটা কল্পনা করে নিয়েছিলাম যে আমরা জান্নাতে চলে গিয়েছি। কিন্তু আসলে সেখানে যাওয়াটাও অতো সহজ না, এর জন্য অনেক কাজ, অনেক আত্মত্যাগ প্রয়োজন এবং এতো কিছু দেওয়ার পরেও যে আমাদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে এটা ধরে নিতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেই দিয়েছেন যে সেখানে যেতে হলে আমাদের অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجت النار بالشهوات وحجت الجنة بالمكاره

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “জাহান্নাম সবারকম কামনা-বাসনা কুপ্রবৃত্তি

ও লালসা দ্বারা পরিবেষ্টিত আর জান্নাত হচ্ছে সর্বপ্রকার অপছন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু দ্বারা বেষ্টিত।” (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের পেছনের কাহিনী হলো, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জান্নাত ও নার(জাহান্নাম) সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি জিবরাঈল আ. কে বললেন, সেগুলোকে পরিদর্শন করে আসতে। অতঃপর জিবরাঈল আ. সেখানে পরিদর্শন করে আসলেন এবং সবশেষে আল্লাহ তা‘আলাকে বললেন, “আমি এমন কোন কারণ দেখি না যে জন্য একজন মানুষ এর(জান্নাত) সম্পর্কে জানবে এবং এতে প্রবেশ করবে না। আর আমি এমন কোন কারণও দেখি না যে জন্য একজন মানুষ এর(নার) সম্পর্কে জানবে এবং এটা থেকে দূরে থাকবে না।”

অর্থাৎ জিবরাঈল আ. এর কাছে এটা কমনসেন্স-এর ব্যাপার মনে হয়েছে যে কারণে সবাই জান্নাতে যেতে যা যা করা লাগে সবই করবে এবং পরিশেষে সবাই জান্নাতেই যাবে, কেউই জাহান্নামে যাবে না। এরপর আল্লাহ তা‘আলা জিবরাঈল আ. কে পুনরায় জান্নাত ও নার পরিদর্শনের নির্দেশ দিলেন।

এবার আল্লাহ জাহান্নামকে ‘শাহওয়াত’ অর্থাৎ আমাদের সর্বদা কাঙ্ক্ষিত ও কাম্য বস্তুগুলো দ্বারা, লোভ লালসা দ্বারা বেষ্টিত করে দিলেন। এই জিনিসগুলোই আমাদের পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করে। জাহান্নামকে কল্পনা করুন একটি চুম্বক হিসেবে যেটা আপনাকে এর দিকে আকর্ষণ করছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের আর আমার মাঝে সাদৃশ্য হচ্ছে মরুভূমির মাঝে একটি ব্যক্তি ও একটি আগুনের কুণ্ডের ন্যায়।”

ধরে নিন একজন ব্যক্তি মরুভূমির মাঝে শীতের রাতে আলো ও উত্তাপ এর আশায় আগুন জ্বালিয়ে কুণ্ড তৈরি করেছে এবং মরুভূমির হারপোকা ও অন্যান্য পোকামাকড় সেই আগুনকে আলো মনে করে দলবেঁধে এসে এতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, কিন্তু লোকটি পোকামাকড় গুলোকে আগুনে লাফিয়ে পড়া হতে রক্ষা করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমাদের সম্পর্কটাও এরকম।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “আমি তোমাদের কাপড় ধরে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে চাইছি কিন্তু তবুও তোমরা জোর করে এর প্রতি অগ্রসর হচ্ছে।”

অন্ধকার রাতে বাইরে খোলা জায়গায় কোন বাতি জ্বালিয়ে রাখলে পোকামাকড় আলো মনে করে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খুব দ্রুত ছুটে এসে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের অজান্তে আত্মাহুতি দেয়। আগুন জিনিসটা যতই ভয়াবহ হোক, যেহেতু আলো পোকাদের জন্য আকর্ষণীয়, তাই পোকাগুলো যেমন আলোর উৎস মনে করে এতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমরাও দুনিয়ার বাহ্যিকভাবে দেখতে আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের মোহে পড়ে জাহান্নামের প্রতি ধাবিত হচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু আমাদের সতর্কই করছেন না, তিনি আমাদের কাপড় ধরে টেনে আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিতে চাইছেন, কিন্তু আমরা তাঁর তোয়াক্কা না করে আগুনের দিকেই ধেয়ে চলেছি।

যাই হোক, এরপর জিবরাঈল আ. জান্নাতের দিকে গেলেন এবং দেখতে পেলেন জান্নাতের পথে এতগুলি বাধা-বিপত্তি এবং জান্নাত সবারকম অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা বেষ্টিত। এরপর জিবরাঈল আ. আল্লাহ তা‘আলার কাছে ফিরে এলেন এবং বললেন, “এখন আমার মনে হয় না কেউ জান্নাতে যেতে পারবে, বরং সবাই জাহান্নামে পতিত হবে।” ইমাম নববী রহ. যিনি সহিহ মুসলিম এর হাদীসের ব্যাখ্যায় অন্যতম সেরা, তিনি এই হাদীস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,

هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن ، ومعناه : لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره ، والنار بالشهوات ، وكذلك هما محجوبتان بهما ، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب ، فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره ، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات ، فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد

في العبادات ، والمواظبة عليها ، والصبر على مشاقها ، وكظم الغيظ ، والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ، ونحو ذلك .

অর্থ: “জাহান্নাম ও জান্নাত পর্দা দ্বারা আবৃত। একজন জান্নাত বা জাহান্নামে যেতে পারবে না যদি সে পর্দাটি অতিক্রম করতে না পারে। আর এই পর্দা ভেদ করে জান্নাতে যাবার উপায় হচ্ছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ও কঠিন কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে যাওয়া। উদাহরণ স্বরূপ, ইবাদতের প্রতি খুবই সচেতন ও দায়িত্বশীল থাকতে হবে। ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল, করুণাময়, দানশীল হতে হবে, ক্রোধ দমন করতে হবে, পাপ হতে দূরে থাকতে হবে।”

সুতরাং জান্নাত লাভ করতে হলে এই কাজগুলো করতে হবে যতই কঠিন ও অপছন্দনীয় হোক না কেন।

আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে জান্নাতের বাসিন্দারা জাহান্নামের বাসিন্দাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করবে। দুনিয়াতে বসবাসকারী সকল মানুষের জান্নাতে কিছু না কিছু সম্পত্তি আছে। কারণ আমাদের আদি আবাসস্থল হচ্ছে জান্নাত, সেখান থেকেই আমাদের আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা পরবর্তীতে এক রকম অন্য জায়গায়(দুনিয়ায়) নিজেদের আশ্রয় করে নিয়েছি, আর একেই আমরা জন্মস্থান বলি, যদিও আমাদের প্রকৃত উৎস হচ্ছে জান্নাত।

আমরা জান্নাতের উত্তরসূরি। কেননা হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. হচ্ছেন আমাদের আদি পিতা-মাতা-যাদের জন্ম জান্নাতে হয়েছিলো। যে কারণে আমাদের প্রত্যেকেরই জান্নাতে আশ্রয়স্থল বা কিছু না কিছু সম্পত্তি আছে। একজন যদি দুনিয়াতে পাপকর্ম ও অবাধ্যতায় জীবন ব্যয় করতে চায়, পরিশেষে সে জাহান্নামে পতিত হবে আর জান্নাতে তাদের সম্পত্তিগুলোর মালিকানা চলে যাবে সেই অল্প কয়েকজন আদম সন্তানের হাতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং জান্নাতের একজন বাসিন্দা হতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং জান্নাতের একজন বাসিন্দা হতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং জান্নাতের একজন বাসিন্দা হতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং জান্নাতের একজন বাসিন্দা হতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জাহান্নামের বাসিন্দাদের তুলনায় জান্নাতের বাসিন্দাদের সংখ্যা অনেক কম হবে, এক হাজারে একজন জান্নাত লাভ করবে, বাকিরা জাহান্নামে পতিত হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

অর্থ: “এই যে, জান্নাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল।” (সূরা যুখরুফ ৪৩, আয়াত ৭২)

অর্থাৎ, একজনের সৎকর্মগুলোর কারণে তাকে জান্নাতের সম্পদের উত্তরাধিকারী করা হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ বুখারীতে বলেন,

“জান্নাতে বসবাসকারীদের অধিকাংশ হবে ‘আদ-দুয়াফা’দের অন্তর্ভুক্ত।” তিনি বলছেন, “আমি কি তোমাদের জান্নাতের বাসিন্দাদের সম্পর্কে বলবো? এর মধ্যে থাকবে প্রতিটি গরীব বিনয়ী ব্যক্তি এবং সে যদি কিছু করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে, আল্লাহ তা মঞ্জুর করবেন। যেখানে জাহান্নামের বাসিন্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সকল নিষ্ঠুর, কঠোর, অহংকারী ব্যক্তি।”

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বিতর্ক করবে। জাহান্নাম বলবে, আমাকে প্রতাপশালী, শক্তিদর, স্বৈরাচারদের দেয়া হয়েছে। আর জান্নাত বলবে, আমার যে কী হলো? শুধু আমার এখানে দুর্বল আর সমাজের পতিত মানুষগুলো আসছে। তখন আল্লাহ জান্নাতকে বলবেন: তুমি হলে আমার রহমত ও করুণা। আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমার রহমত দ্বারা অনুগ্রহ করি। আর তিনি জাহান্নামকে বলবেন: আর তুমি হলে আমার আযাব। বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আমি আমার আযাব দিয়ে শাস্তি দিয়ে থাকি।” (বুখারী ও মুসলিম)

গরীব ব্যক্তির সাধারণত বিনয়ী হয়ে থাকে। তাদের এমন কোন সম্পত্তি বা এমন কিছু থাকে না, যা তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তাই তারা সাধারণত সৎকর্মের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য জান্নাতের জনসংখ্যার সিংহভাগ তারাই দখল করে রাখবে।

তবে এর মানে কোনোভাবেই এটা নয় যে, কারো যদি অর্থ-সম্পদ থেকে থাকে তাহলে তারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। একজন ব্যক্তি কোথায় গিয়ে থামবে, জান্নাতে না জাহান্নামে এর পিছে টাকা-পয়সার কোনো ভূমিকা নেই, বরং এটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করছে তার গন্তব্যস্থল। কেউ যদি সৎ উদ্দেশ্যে, সৎপথে তার সম্পদ ব্যয় করে, তবে তার এই অতিরিক্ত ত্যাগ এর কারণেই সে জান্নাতে একজন দরিদ্র ব্যক্তির চেয়েও বেশি মর্যাদা পাবে।

সাহাবাদের মধ্যে যে ১০ জনকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল সবচেয়ে ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকর আস-সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাবদেরকে সম্পদশালী সাহাবা হিসেবে গণ্য করা হত। উসমান ইবনে আফফান সন্দেহাতীতভাবে ছিলেন সবচেয়ে ধনীদের একজন। আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ, যিনি সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জনের একজন ছিলেন, তিনি ছিলেন সে সময়কার কোটিপতি। একই কথা আলি ইবন আবি তালিব এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তিনিও সম্পদশালী ছিলেন।

কিন্তু তারা জানতেন যে, তাদের এই সম্পত্তি কিভাবে খরচ করতে হবে। সমস্যা হলো এটা যে, যখন কোন ব্যক্তির দুর্বলতা দূর হয়ে যায়, অর্থবিত্তের মোহ তাকে প্রলুদ্ধ করে, তখন সে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

দরিদ্র ব্যক্তির যেহেতু এতো কিছু থাকে না, তারা সাধারণত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বেশি নিকটবর্তী হয়ে থাকেন। এছাড়াও কারো যদি অনেক সম্পত্তি থেকে থাকে, সম্পদের হাত ধরেই ক্ষমতা আসে। যথেষ্ট টাকা-পয়সা থাকলে অনেক কিছু সম্ভব হয়, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব না, আর এটাই ক্ষমতা।

এটা একজন মানুষকে এই অনুভূতি দিবে যে সে স্বাবলম্বী, তার আর কারো সাহায্য প্রয়োজন নেই, যদি সেই সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবুও। আর ঠিক এটাই কারুণ বলেছিল। তার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْفُئَصَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَذِّبُ اللَّهُ بَيْنَهُمُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَذِّبُهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

অর্থ: “নিশ্চয়ই কারুণ ছিল মূসার কওমভুক্ত। অতঃপর সে তাদের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, নিশ্চয়ই তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের ওপর ভারী হয়ে যেতো। স্মরণ করো, যখন তার কওম তাকে বলল, ‘দস্ত করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিকদের ভালোবাসেন না।’

আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান করো। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ করো। আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না।’

সে বললো, ‘আমি তো এই ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞান দ্বারা’। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা ছিল তার থেকে শক্তিমত্তায় প্রবলতর এবং জনসংখ্যায় অধিক। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। অতঃপর সে তার কওমের সামনে জাঁকজমকের সাথে বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবন চাইতো তারা বললো, ‘আহা! কারুণ কে যেমন সম্পদ দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমন থাকতো! নিশ্চয়ই সে বিরাট সম্পদশালী।’

আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলো, তারা বললো, ‘খিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবারকারীরাই পেতে পারে।’

অতঃপর আমি কারুণ ও তার প্রাসাদকে মাটিতে দাবিয়ে দিলাম। তখন তার জন্য এমন কোন দল ছিলো না, যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিলো না।

আর গতকাল যারা তার মতো হতে প্রত্যাশা করেছিল তারা বলতে লাগলো, ‘আশ্চর্য! দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিয়ক প্রসারিত অথবা সংকুচিত করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি দাবিয়ে দিতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফল হয় না’।

এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ: “কেউ পুণ্য নিয়ে আসলে তার জন্য থাকবে তা থেকে উত্তম প্রতিদান। আর যারা মন্দকর্ম করেছে তাদের শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে যা তারা করেছে।” (সূরা কাসাস, আয়াত ৮৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **الغنى المطغى** বা অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী সম্পদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, পানাহ চেয়েছেন।

إنما هي استعاضة من الغنى المطغى. فالغنى مع الطغيان مذموم.

অর্থ: “অহংকারী করে দেয়া সম্পদ থেকে মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এমন সম্পদ যা তোমাদের সীমা লঙ্ঘন করতে বাধ্য করবে। তা খুবই নিন্দনীয়।”

সুতরাং সম্পদের কথা যদি আসে, আখিরাতে এটি আমাদের জন্য কি ভূমিকা রাখবে এর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাই সবচেয়ে ভালো জানেন, তার সৃষ্টির জন্য কোন জিনিসটা উত্তম। কিছু মানুষের জন্য সম্পদই উত্তম, আল্লাহ যদি তাদের দরিদ্র করে দুনিয়ায় পাঠাতেন সেটাই তাদের অসৎ করে দিতো।

আর কিছু মানুষের জন্য দারিদ্র্যই উত্তম, আল্লাহ তাদের সম্পদ দান করলে সেটা তাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হিসেবে দাঁড়াতো। কিছু মানুষের জন্য স্বাস্থ্যই উত্তম, আল্লাহ যদি তাদের অসুস্থতা দান করতেন, সেটা তাদের ক্ষতির কারণ হত। আর কিছু মানুষের জন্য অসুস্থতাই উত্তম, আল্লাহ যদি তাদের সুস্থতা দান করতেন, তবে সেটাই তাদের পথভ্রষ্ট করে দিতো। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং আমাদের জন্য কি উত্তম সেটা তিনিই ভালো জানেন’।

জান্নাতের অবশিষ্ট বিষয়াবলী

আজকে আমরা আমাদের ‘পরকালের পথে যাত্রা’ সিরিজের শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আ‘লামীনের জন্য- লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ধারাবাহিকভাবে মৃত্যু থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে, সাকারাতুল মাউত অর্থাৎ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ, কবরের জীবন, কিয়ামতের আলামতসমূহ, কিয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাব, পুলসিরাত, জাহান্নাম এবং জান্নাতের আলোচনার মাধ্যমে আজকে আমরা প্রায় শেষ সেশনে এসে উপস্থিত হয়েছি, আজকের আলোচনা সমাপ্ত হবে জান্নাতের অবশিষ্ট আলোচনার মাধ্যমে- যেখানে আমরা প্রধানত আলোচনা করবো কারা দুনিয়া থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ইনশা আল্লাহ।

আসুন শুরু করা যাক, প্রথমেই একটি মিলিয়ন ডলার প্রশ্নের উত্তর জানা যাক!

জান্নাতে কাদের সংখ্যা বেশি-নারী না পুরুষ

-জান্নাতের অধিকাংশ মানুষ কারা? নারী না পুরুষ?

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একবার সাহাবাদের মধ্যে একটি কথোপকথন শুনলেন। উপস্থিত পুরুষদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিলেন, যারা গর্ব ভরে বলছিলেন যে, জান্নাতে পুরুষদের সংখ্যা নারীদের থেকে বেশি। এরপর আবু হুরায়রা সেখানে একটি মন্তব্য করলেন, হাদীসটি সহীহ মুসলিমে রয়েছে,

أما تفاخروا وأما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء) فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي بعدها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقها من وراء اللحم وما في الجنة أعزب.

অর্থ: “তোমরা এটা নিয়ে গর্ব করছো যে, জান্নাতে পুরুষদের সংখ্যা বেশি না নারীদের সংখ্যা বেশি?”

আবুল কাসিম (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি একথা বলেন নি যে, প্রথম যেই দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তা হবে পূর্ণিমার রাতে পূর্ণ চাদের মতো। তারপর যেই দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তা হবে আসমানের আলোকিত তারকারাজির মতো। জান্নাতের প্রত্যেক পুরুষের জন্য দুইজন স্ত্রী থাকবেন। (তারা এতো সুন্দর হবে) যাদের হাড়ের ভেতরকার মগজও বাহির থেকে দেখা যাবে।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৪)

এই হাদীসের মাধ্যমে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. সাহাবীদের সেই মজলিসে উপস্থিত লোকদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন -যারা জান্নাতে পুরুষদের সংখ্যা বেশি এটা নিয়ে গর্ব করছিলেন। অর্থাৎ আবু হুরায়রা তাদেরকে বললেন, জান্নাতে কোনো পুরুষ অবিবাহিত থাকবেন না, আর প্রত্যেক পুরুষের জন্য দুইজন স্ত্রী থাকবেন, কাজেই জান্নাতের নারীদের সংখ্যা পুরুষদের দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।
আর এই সংবাদটি বোনদের জন্য একটি আনন্দের বিষয়।

যাই হোক, বোনদের জন্য একটি ছোট আশংকাও আছে- আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত জানি না, সেই দুইজন স্ত্রী কি দুনিয়ার মানুষদের মধ্য থেকে হবেন, নাকি তারা হরুল আইনদের মধ্য হতে হবেন।

উপরন্তু সহীহ মুসলিম এবং বুখারীতে বর্ণিত এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"إِنَّ أَقْلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ" . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

অর্থ: হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি জান্নাতে মহিলাদের সংখ্যা খুব কম দেখেছি।” (বুখারী ও মুসলিম)
অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورايت النار فلم ارى منظرأ كاليوم قط ورايت أكثر اهلها النساء .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি জাহান্নাম দেখেছি। আর সেখানকার ভয়াবহ অবস্থার মতো আর কিছু আমি কখনো দেখি নি। সেখানকার অধিকাংশই মহিলা।” (বুখারী ও মুসলিম)

এর কারণ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال خرج رسول الله . صلى الله عليه وسلم . في أضحى . أو في فطرٍ ، إلى المصلّى ، فمرَّ على النساء فقال : يا معشر النساء تصدّقن ، فإني أريتكن أكثر أهل النار .

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে নারীগণ! তোমরা দান-সাদাকা করো। আর বেশী বেশী করে আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা, আমি জাহান্নামে তোমাদের অধিকহারে দেখেছি। এ কথা শোনার পর উপস্থিত মহিলাদের মধ্য থেকে একজন -যার নাম ছিলো জাযলা- তিনি প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেন এ অবস্থা? কেন জাহান্নামে আমরা বেশী সংখ্যায় যাবো?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা স্বামীর প্রতি বেশী অকৃতজ্ঞ ও অভিশাপ দাও বেশী।” (বুখারী ও মুসলিম)

বলতে খারাপ শুনালেও আসলে আমাদের সমাজের নারীদের বাস্তব চিত্র এরকমই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। আমি দাম্পত্য জীবনে অনেক সুখী নারীকে দেখেছি তারা স্বামীর প্রতি অনেক সময় তুচ্ছ বিষয়ে চরম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। অনেক সময় সামান্য বিরক্ত হলে নিজ সন্তানদেরও অভিশাপ দেয়। নারীদের জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য এ দু’টো স্বভাব পরিহার করতে হবে অবশ্যই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বলার উদ্দেশ্য এটাই।

তিনি নারীদের স্বভাব সংশোধন করার জন্যই এ কথা বলেছেন। নারীদের খাটো করা বা তাদের ভূমিকা অবমূল্যায়নের জন্য বলেন নি।

শিশুদের কথা

শিশুদের ক্ষেত্রে কি হবে? তারা কি জান্নাত লাভ করবে না জাহান্নামে যাবে? আসুন, শিশুদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যাক। মুসলিমদের শিশু সন্তান এবং কাফিরদের শিশু সন্তান। আর শিশু বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা বালগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়। ইসলামে বয়সস্কিকাল বলে কিছু নেই, হয় আপনি একজন বালগ বা প্রাপ্তবয়স্ক অথবা আপনি একজন নাবালগ বা অপ্ৰাপ্তবয়স্ক।

মুসলিমদের শিশু সন্তান

ইমাম নববী রহ. বলেন, আলেমদের ঐকমত রয়েছে যে, মুসলিমদের যে সকল সন্তানাদী প্রাপ্ত বয়স্ক পূর্বেই মারা যায়, মুকাল্লাফের আগে, তারা জান্নাতে যাবে। কেননা মহান আল্লাহ কুর'আনে বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

অর্থ: “যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাঁদের অনুগামী, আমি তাঁদেরকে তাঁদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেবো এবং তাঁদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজ কৃতকর্মের জন্যই দায়ী হবে।” (সূরা তূর, আয়াত ২১)

এবং এই সন্তানদের পিতার ব্যাপারে বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “একজন মুসলিমের যদি তিনটি সন্তান

নাবালগ অবস্থায় মারা যায়, তবে তাকে আল্লাহর রহমত জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” (সহীহ বুখারী)

কাজেই মুসলিমদের সন্তানরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে, মুসলিম পিতাও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মায়ের কি হবে

বুখারী বর্ণনায়

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَقْدُمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ.

অর্থ: আবু সাঈদ আল খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্ত্রী লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললো, পুরুষরা আমাদেরকে পরাজিত করে রেখেছে। (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিকাংশ সময় পুরুষরা নিয়ে নিয়েছে, মহিলাদের জন্য আলাদা কোন সময় ছিল না) তাঁরা বললো, সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন। তিনি তাঁদেরকে একটি দিনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেদিন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে উপদেশ আদেশ দিতেন।

একবার তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের যে কোন নারীর তিনটি সন্তান মারা গেলে তা তাঁর জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা স্বরূপ হবে। একজন মহিলা বললো, যদি দু'টি সন্তান হয়? তিনি বললেন, দুটি হলে তাও জাহান্নামের আগুন থেকে পর্দা স্বরূপ হবে।” (সহীহ বুখারী, মহিলাদের ইলম শেখার জন্য আলাদা দিন নির্ধারণ অধ্যায়) হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, উক্ত হাদীসে বর্ণিত তিনটি সন্তান হওয়ার অর্থ এমন সন্তান, যারা গুনাহ করার বয়স হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে।

একটি সতর্কতা

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি যে মুসলিমদের শিশু সন্তানাদী জান্নাতে যাবে, কিন্তু আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি না- সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না যে অমুক ব্যক্তিটি জান্নাতে যাবেই। কারণ অপর একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فُدْعِيَ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: طُوبَى لِهَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ غُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ. قَالَ وَمَا يُدْرِيكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ لِلْجَنَّةِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.

অর্থ: হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন তখন আনসারদের জনৈক শিশুর জানাযার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। তিনি জানাযা পড়লেন। তখন এবং আমি বললাম ‘এই শিশুটির জন্য সুসংবাদ রয়েছে, যে কিনা জান্নাতের পাখিদের মধ্যে একটি পাখি’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! ‘তুমি কি জানো না, আল্লাহ জান্নাত এবং তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি জান্নাত এবং জাহান্নামের বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন এমতাবস্থায়-যখন তারা তাদের পিতার ঔরসে ছিলো।’ (সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়)

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি. এর উপরোক্ত কথাটি পছন্দ করেন নি। কারণ তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলছিলেন যে এই বাচ্চাটি জান্নাতে যাবে। সুতরাং আমরা আম বা ব্যাপকভাবে শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার ওপর আশা করতে পারি বা মন্তব্য করতে পারি কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোনো শিশুর ক্ষেত্রে এটি বলা যাবে না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ ব্যাপারে বলেন,

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة، وإن شهد لهم مطلقاً

অর্থ: ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, “মুসলিমদের কোনো নির্দিষ্ট শিশুর ক্ষেত্রেও এটা বলা যাবে না যে সে জান্নাতী। যদিও অনির্দিষ্টভাবে মুসলিম শিশুদেরকে জান্নাতী বলা যেতে পারে।” (মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খন্ড, ২৮১ পৃষ্ঠা)

কাফিরদের সন্তান

কাফির ও মুশরিকদের সন্তানাদীর ক্ষেত্রে কি হবে?

এ সম্পর্কে বুখারীতে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অমুসলিমদের সন্তানাদী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানেন তারা কি করবে, কাজেই এখানে এই বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্মুক্ত ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা এই বিষয়ে বিচার করবো না যে, তাদের কি পরিণতি ঘটবে।

ইবনে হাজার এই হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেন, আবু ইয়াল্লা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস রয়েছে যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে আবেদন করেন যেন তাকে মানবজাতির সকল শিশুদের ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়-মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে। তিনি তাদের জন্য শাফায়াত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ আমাকে সেটা প্রদান করেছেন। এই হাদীসটি হাসান, সহীহ নয়। আমরা এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারি কিন্তু এটা পূর্বের হাদীসটির মতো এত শক্তিশালী নয়।

তৃতীয় আরেকটি হাদীস, যা বর্ণিত হয়েছে আবু নাসিমে এবং আবু ইয়াল্লাতে, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,

عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أولاد
المشركين خادما أهل الجنة.

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “অমুসলিমদের শিশু-সন্তান জান্নাতীদের খাদেম হবে।” সুতরাং তারাও জান্নাতে থাকবে কিন্তু খাদেম হিসেবে, আলেমগণ বলেছেন যে এই হাদীসটি সহীহ।” (আবু দাউদ)

এখন, এই হাদীসগুলোর মধ্যে আলেমগণ কিভাবে সমস্বয় সাধন করেছেন?

قال النووي رحمه الله بعد أن حكى أقوال العلماء فيهم: والثالث وهو
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل له
بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم
في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا يا رسول الله: وأولاد المشركين؟
قال: وأولاد المشركين. رواه البخاري في صحيحه. ومنها قوله
تعالى: [وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا] (الإسراء: 15). اهـ.

অর্থ: “ইমাম নববী রহ. উলামায়ে কিরামের মতামত বর্ণনার পর বলেন, তবে এ ব্যাপারে তৃতীয় ও সর্বসম্মত মত এটিই যা মুহাক্কিক উলামাগণ ব্যক্ত করেছেন। আর তা হলো মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শিশুরাই জান্নাতী হবে। এর স্বপক্ষে কয়েকটি বিষয় রয়েছে। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই হাদীস-মে'রাজের রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবরাহীম আ. এর চতুর্পার্শ্বে জান্নাতে অনেক শিশু-কিশোরদেরকে দেখেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে সেখানে কি মুশরিকদের সন্তানরাও ছিলো? তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ, মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও ছিলো। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে সূরায় ইসরা এর ১৫ নং আয়াতটি

লক্ষ্যণীয়। যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন, “নিশ্চয়ই আমি কাউকে আযাব দেই না, যতক্ষণ না তার কাছে আমি রাসূল প্রেরণ করি।” এই একই মত দিয়েছেন, আল যাওয়ী, ইমাম নববী এবং আল কুরতুবী। আল কুরতুবী বলেন, এই বিষয়টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সময়ের ব্যবধানে বিস্তারিত ইলম লাভ করেছেন। শুরুতে তিনি বলেছেন, এরা তাদের পিতাদের সাথে জাহান্নামী হবে। পরবর্তীতে, তিনি বলেছেন এই বিষয়টি আমাদের বিচার করার বিষয় নয় যে, তাদের পরিণতি কি হবে। এরপর, তিনি বলেছেন, তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং তারা জান্নাত লাভ করবে। আল কুরতুবী বলেন, একারণেই এই বিষয়ে আমরা বিরোধপূর্ণ দলীল দেখতে পাই।

আরেকটি মত হচ্ছে, তাদের ওপর আমরা বিচারক নই। আল্লাহ তাদেরকে বিচারের দিনে পরীক্ষা করবেন। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, কিভাবে আল্লাহ পাগল অন্ধ এবং বধির ব্যক্তিকে পরীক্ষা করবেন এবং এটা হচ্ছে আবু হাসান আল আশযারী এর মত। আবু হাসান এটাকে আহলুস সুন্নাহ এর অফিসিয়াল অবস্থান বলে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

আমরাও এই বিষয়টিকে এখানে ছেড়ে দেই, এ বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। এবং এটা গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ততটুকু পর্যন্ত কথা বলতে পারি যতটুকু সম্পর্কে আমরা জানি, কিন্তু এর বাইরে আমরা কথা বলব না।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত যারা

জান্নাতের নিশ্চয়তা যে কেউ পেয়েছে এটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। এটা সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। কোন ব্যক্তিকে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠানোর কথা বলে আপনি নিজেকে আল্লাহর পর্যায়ে তুলে নিচ্ছেন (নাউযবিলাহ)।

عن أبي هريرة في قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحداً عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسدّدوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله أن يزداد خيراً، وإما مسيئاً فلعله أن يستعذب.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কোন ব্যক্তির ভালো আমল তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না”।

সাহাবারা বললেন: “এমনকি আপনাকেও না হে আল্লাহর নবী?”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যুত্তরে বললেন, “এমনকি আমাকেও নয়, যদি না আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহ আমার ওপর বর্ষিত হয়।”

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো একজন ব্যক্তি বলেন যে তাঁর আমল তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না-তাহলে আমাদের অবস্থানটা কি হবে চিন্তা করে দেখুন তো?

সুসংবাদপ্রাপ্ত পুরুষ

روى الترمذي وابن ماجه وأحمد

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين،

অর্থ: “হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছেন, আবু বকর এবং উমর রাযি. -তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলিমদের সরদার হবে- তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী রাসূলগণ ব্যতীত।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আম্মিয়ারদের পরেই জান্নাতীদের মধ্যে তাঁরা দু'জন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি”। তারপর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযি. কে বলেন, “তাঁদেরকে তুমি একথা জানিয়ে না।” (তিরমিযি, ইবনে মাযা)

সুতরাং আম্মিয়ারদের পরে আবু বকর রাযি. এবং উমর রাযি. আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। (তিরমিযি, মানাকের অধ্যায়, হাদীস ২৮৯৭)

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة .

তিরমিযীতে আরো একটি বর্ণনায় এসেছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে জান্নাতে তরুণদের সর্দার হবে হাসান রাযি. এবং হুসাইন রাযি.।” (তিরমিযি, হাদীস ৩৭৪১। ইবনে মাযাহ, হাদীস ১১৮)

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাতি, ‘আলী বিন আবি তালিব রাযি. এর সন্তান।

আহমাদে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, “একজন ফেরেশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে এই ফেরেশতা কখনোই তাঁর নিকট আগমন করেন নি। সেই ফেরেশতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এটা বলতে এসেছিলেন যে জান্নাতে যুবকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয় হলেন হাসান রাযি. এবং হুসাইন রাযি.”।

কেন বয়স্ক এবং তরুণদের কথা বলা হল? জান্নাতে কি সবাই সমবয়সী হবে না? হ্যাঁ, কিন্তু কিছু মানুষকে বয়স্ক বলার কারণ তাঁরা বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর কিছু মানুষকে তরুণ বলার কারণ হল তাঁরা অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সুসংবাদপ্রাপ্ত নারী

عن ابن عباس قال: خط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأرض أربعة أخطط، ثم قال: تدرّون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد،

ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালুর মধ্যে লাঠি দিয়ে চারটা রেখা টানলেন আর বললেন, “তোমরা কি জানো কেন আমি এই লাইন চারটি টানলাম?” সাহাবারা বললেন, “না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “জান্নাতে নারীজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন চারজন-মারইয়াম বিনত ইমরান, খাদিজা বিনত খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ এবং আসিয়া ইবন মুযাহিম”।

কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লাইন চারটি টেনেছিলেন? এটা ছিল সাহাবাদের মনযোগ আকর্ষণের জন্য একটি নির্দেশনামূলক পদ্ধতি, teaching method। সাধারণত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এরকম করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে উত্তরটি তাঁদের অজানা, কিন্তু তিনি তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এটা করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা প্রায়ই করতেন।

সুতরাং নারীদের মধ্যে এ যাবৎ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে নারী পৃথিবীর বুকে বেঁচেছিলেন তিনি হলেন- মারইয়াম বিনত ইমরান (ঈসা আ. এর মাতা)। তারপরেই রয়েছেন হযরত খাদিজা রাযি., তৃতীয় হলেন ফাতিমা রাযি. এবং চতুর্থ হলেন আসিয়া।

প্রথমজন, মারইয়াম সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআনে বলেছেন:

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থ: “আর যখন ফেরেশতা বলল, হে মারইয়াম!, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন” ৩-৪২

পরবর্তী আছেন, খাদিজা রা।)। আমরা জিবরাঈল আ. এর হাদীসটি বর্ণনা করেছি যেখানে জিবরাঈল আ. সালাম প্রেরণ করেছিলেন খাদিজা রাযি. এর প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আর তাঁকে জান্নাতে একটি প্রাসাদের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। আমল অনুযায়ী পুরস্কার-খাদিজা রাযি. মক্কাতে স্বল্প পরিসরের একটি জায়গায় বাস করতেন, তাই আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে একটি প্রাসাদ প্রদান করেছেন। তাছাড়া খাদিজা রাযি.কে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল কেবলমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সহযোগিতা করার জন্য আর এই কারণেই আল্লাহ জান্নাতে তাঁকে চিরশান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করবেন।

আসিয়া সম্বন্ধে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ

بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: “আল্লাহ তা’আলা মুমিনদের জন্য ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিগটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।” (সূরা তাহরীম ৬৬, আয়াত ১১)

আসিয়া বিনত মুযাহিম পৃথিবীর বুকে ফেরাউনের নির্মিত সবচেয়ে চাকচিক্যময় প্রাসাদে বাস করতেন। দুনিয়ার বুকে একজন মানুষ যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে তার সবই আসিয়ার ছিল, কিন্তু তারপরও তিনি বলেছেন: “ও আল্লাহ, আমাকে জান্নাতে একটি প্রাসাদ দান করুন”। সুবহানাল্লাহ, এমন একজন মহিলার কথা আমরা বলছি যাকে যাবতীয় জাগতিক সামগ্রী প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু তিনি বলেছেন তাঁর এগুলোর কিছুই প্রয়োজন নেই, তিনি চেয়েছিলেন জান্নাতে একটি শান্তিময় স্থান আর ফেরাউন এবং তার কৃতকর্ম থেকে মুক্তি। আসিয়ার সবকিছু ছিল, ক্ষমতা, সম্পদ, খ্যাতি কিন্তু এগুলো কিছুই তিনি চাইলেন না। অথচ বর্তমানে নারীরা কত সামান্য বিনিময়ে নিজেদের নষ্ট করছে।

ফাতেমা রাযি. কে এরূপ মহান মর্যাদা দেয়ার কারণ তিনি এক পবিত্র সংসারে বড় হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর পিতার সাথে সকল দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি একজন কন্যা হিসেবে সফলতা অর্জন করেছেন।

যাতে তাদের মাধ্যমে এই উম্মাইহ সদপে সামনে আসতে পারেন।
মূসা আ. এবং ইসা আ. হলেন দুজন নারীর গর্ভজাত সন্তান যাঁরা
তাঁদেরকে বড় করে তুলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি যদি মূসা আ. এর
জীবনী দেখেন তাহলে দেখবেন যে তিনি সার্বক্ষণিকভাবেই কয়েকজন নারী

দ্বারা সহায়তাপ্রাপ্ত হন যারা সবসময় তাঁকে সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁকে মুসা আ. হিসেবে তৈরি করেছিলেন। প্রথমে ছিলেন তাঁর মা, এর পরে তাঁর বোন, পরবর্তীতে ফেরাউনের স্ত্রী, অতঃপর হযরত শু'আইব আ. এর কন্যা এবং তারপরে শু'আইব আ. এর কন্যা যিনি তাঁকে বিয়ে করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবলম্বন ছিলেন দুইজন মানুষ-তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাযি. এবং চাচা আবু তালিব। তাঁরা দুজনেই এক সপ্তাহর ব্যবধানে ইশ্তেকাল করেন আর এই কারণে সেই বছরটা ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সবচেয়ে কষ্টকর বছর।

আমরা আলোচনা করছিলাম জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের সম্পর্কে, প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে, দশজন জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, কিন্তু জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের সংখ্যা দশজনেরও বেশি, কিন্তু একসাথে একই হাদীসে একত্রে যে দশজনের নাম এসেছে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ কারা?

সৌভাগ্যবান দশজন

তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَسَعْدُ وَسَعِيدُ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ " ،

“আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উছমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আব্দুর রহমান বিন আউফ জান্নাতী, সা'দ জান্নাতী, সা'ঈদ জান্নাতী, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী”। আবু মুসা আল আশ'আরী কর্তৃক বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে:

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ جَاءَ عُثْمَانُ لَيْلَةً. إِنَّ اللَّهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ حَتَّى تَلْقَانِي. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ رِبِيعَةَ ، مِثْلَهُ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমান রাযি.কে বলেছিলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাকে একটি পরিচ্ছদ (পরার জন্য) দান করবেন। মানুষজন এটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আপনার সাথে বিগ্রহে লিপ্ত হবে; আপনি তাদেরকে সেটা দিবেন না।” উছমান তখন জানতেন না এ কথার মানে আসলে কি। সেই পরিচ্ছদ হল খিলাফত। উছমান ইবন আফফান রাযি. উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যাপারেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; তিনি খিলাফত ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু তিনি এও বলেছিলেন যে এর বিভক্তির জন্য এক ফোঁটা রক্তপাতও তিনি চান না। সাহাবাদের মধ্যে অনেক তরুণ সাহাবীরা তাঁকে রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন-এদের মধ্যে ছিলেন হাসান এবং হুসাইন রাযি. কিন্তু তিনি চান নি যে তাঁর জন্য রক্তপাত শুরু হোক। খারেজিরা তাঁর গৃহে জোরপূর্বক প্রবেশ করে এবং উছমান রাযি.কে হত্যা করে। তিনি সে সময় কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তার দেহের রক্ত মুসহাফের ওপর ছড়িয়ে পড়ে।

আবু মুসা আশ'আরী বলেন যে, তিনি ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করেছেন যেভাবে কূপের কিনারায় তাঁদের বসার অবস্থান বিন্যস্ত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন কূপের কিনারায়, আবু বকর ও উমর রাযি. ঠিক তাঁর পাশেই বসেছিলেন। উছমান রাযি. একটু দূরে উল্টো পাশে বসেছিলেন, কারণ রাসূলের পাশে যথেষ্ট বসার জায়গা ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর এবং উমর রাযি. আ'যিশা রাযি. এর গৃহে সমাহিত কিন্তু উছমান রাযি. বাকি'তে সমাহিত।

আরো যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন

১ হামযা রাযি.

قَالَ : حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ‘শহীদদের সর্দার হলেন হামযা রাযি.।’

এর দ্বারা এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে তিনি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানের বাসিন্দা।

২ জাফর বিন আবি তালিব রাযি.

তিরমিযীতে বর্ণিত (?) আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি জা’ফর বিন আবি তালিবকে দেখেছি জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে দুইটি পাখা নিয়ে যুদ্ধ করছেন।

কেন তিনি দুইটি পাখা নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন? তিনি ছিলেন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো সেনাবাহিনীর সেনাপতি। তিনি সমর পতাকা তাঁর হাতে বহন করছিলেন আর তাঁর দুটি বাহুই ছেদ করা হয়েছিল, তাই তিনি যুদ্ধপতাকাটি তাঁর বুকের ওপর বহন করেছিলেন, আর এভাবেই তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যেহেতু মৃত্যুর সময় তাঁর দুটি বাহু শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সেই কারণে আল্লাহ তাঁর বাহুদ্বয়কে পাখা দ্বারা পরিবর্তন করেছেন।

৩ আবদুল্লাহ বিন সালাম রাযি.

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, যখন মু’আয বিন জাবাল রাযি. মরণাপন্ন ছিলেন, তখন তাঁর এক ছাত্র বলেন, “আমাদের একটি উপদেশ দিন”। মু’আয বিন জাবাল বলেছিলেন, “জ্ঞান তার স্বীয় স্থানেই রয়েছে; তুমি যদি এটা আকাজ্জা কর, তাহলেই তুমি তাকে পাবে।” তিনি প্রথম যে

কথাটি বলেছিলেন তার মানে হল যে জ্ঞান মৃত্যুবরণ করবে না কিংবা অদৃশ্য হবে না। তারপর তিনি বলেন, “যদি তুমি জ্ঞান আহরণ করতে চাও চারজন ব্যক্তির কাছে যাও: আবু দারদা, সালমান ফারসি, ‘আব্দুল্লাহ ইবন মাস’উদ এবং ‘আব্দুল্লাহ ইবন সালাম।’ আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ছিলেন একজন ইহুদী যিনি পরবর্তীতে মুসলিম হন এবং আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে তিনি রাযি. ছিলেন জান্নাতবাসী দশম ব্যক্তি”।

আমরা বলছি না যে তিনি দশম ব্যক্তি হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন বরং এর দ্বারা এটা বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি সবার আগে জান্নাতে প্রবেশকৃতদের একজন। ‘আব্দুল্লাহ ইবন সালাম ছিলেন মদীনার প্রধান ইহুদী ধর্মযাজক। তিনি তাওরাতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা সম্পর্কে জানতেন আর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করেন, তিনি তাঁকে চিনতে পারেন এবং তাঁর ওপর ঈমান আনেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন বলেই সেই জ্ঞান তাঁকে মুসলিম হতে সাহায্য করেছিল। ইহুদীদের মধ্যে যাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প, কিন্তু তাঁরা অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত জাতি। আরবরা ছিল অক্ষর জ্ঞানহীন, কিন্তু ইহুদীদের কাছে আসমানী কিতাব ছিল যেটা তারা অধ্যয়ন করেছিল।

৪ যায়দ বিন হারিসা

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَاسْتَقْبَلْتَنِي جَارِيَةٌ شَابَةٌ ، فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : لَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ)) (روى الروياني و

الضياء عن بريدة)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম আর একজন তরুণীকে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি কার সহধর্মিণী?’ সে জবাব দিলো, “যায়দ বিন হারিছার”। যায়দ বিন হারিছা হলেন আরেকজন ব্যক্তি যিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

৫ যায়দ বিন আমর

আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম আর দেখলাম যে জান্নাতে যায়দ ইবন ‘আমর এর দুইটি স্থান ছিল”। যায়দ ইবন ‘আমর ইবন নুফাইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে ইস্তিকাল করেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে জান্নাতে সাক্ষাৎ করেছিলেন। যায়দ, ইব্রাহিম আ. এর দীন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যের ওপর অবিচল থাকার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। তিনি কখনোই মূর্তির উপাসনা করেন নি। তিনি মানুষদের দাওয়াহ করতেন আর বলতেন যে এইসব মূর্তিসমূহ তোমাদের প্রভু নয়, তারা ভ্রান্ত; তোমাদের উচিত আল্লাহর ইবাদত করা। তিনি মক্কার অধিবাসীদের জবাইকৃত মাংস খেতেন না। তিনি বলতেন যে আল্লাহ এই সকল মেষদের খাদ্য প্রদান করেন আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, কিন্তু যখন তোমরা তাদের জবাই করো, তোমরা এই ভ্রান্ত মূর্তিগুলোর জন্য সেগুলো জবাই করো?!

তিনি এমন কোন পশুর মাংস ভক্ষণ করতেন না, যেগুলো জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় নি; তিনি তাঁর ফিতরাত থেকে এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সুবহানাল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে জান্নাতে যায়দের দু’টি স্থান ছিল।

৬ হারিছা ইবন নুমান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম আর তিলাওয়াত শ্রবণ করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কে সেই ব্যক্তি যিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন?”

তাঁরা বললো, “হারিছা ইবন নু’মান”।

৭ বিলাল রাযি.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং কিছুর আওয়াজ শুনলাম (তিনি কারো পদচারণার আওয়াজ শুনেছিলেন) আর জিজ্ঞাসা করলাম, “ইনি কি?” জিবরাঈল আ.

বললেন, “ইনি বিলাল, মুয়ায্বিন”। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, “বিলাল সফল হয়েছে”।

৮ আবু দারদা রাযি.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু দারদা রাযি. কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর মহত্ত্বের জন্য। তিনি মদীনায় সর্বোৎকৃষ্ট ভূমি খয়রাত করেছিলেন। এছাড়াও আরও কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলোতে অন্যান্য কিছু সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা জান্নাতী-তাঁদের মধ্যে আছেন আমাদের ইবন ইয়াসির, সালমান ফারেসী, উক্বাসা ইবন আবি মিহসান প্রমুখ সাহাবীগণ, আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর রাযি হয়ে যান। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সাহাবাগণ দলগতভাবে বা as a group তারা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন।

৯ দলগতভাবে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ

দলগতভাবে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বদর যুদ্ধে এবং হৃদয়বিয়ার সন্ধির পূর্বে গাছের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণ- “জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: বদরের যুদ্ধে এবং হৃদয়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী কোন লোক জাহান্নামী হবে না।” (আহমদ, আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদীস আস সহীহা, হাদীস: ২১৬০)

১০ আরও আছেন, মুহাজির সাহাবীগণ রাযি.

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামজান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। “আবদুল্লাহ ইবন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা কি জান যে, আমার উম্মতের মধ্যে কোন দলটি সর্ব প্রথম জান্নাতে যাবে? আমি বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন: মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারীরা

কিয়ামতের দিন জান্নাতের দরজায় আসবে আর তাদের জন্য দরজা খুলে যাবে। জান্নাতের দারোয়ান তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে- তোমাদের হিসাব নিকাশ হয়ে গেছে? তখন তারা বলবে কিসের হিসাব? আমাদের তরবারি আল্লাহর পথে আমাদের কাঁধে ছিল আর ঐ অবস্থায়ই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তখন জান্নাতের দরজা তাঁদের জন্য খুলে দেয়া হবে। আর তাঁরা অন্যদের জান্নাতে প্রবেশের চল্লিশ বছর পূর্বে সেখানে প্রবেশ করে আনন্দে অবস্থান করতে থাকবে। (আল্লামা আলবানীর সিলসিলাতুল আহাদীস, আস সহীহা, হাদীস: ৮৫২)

মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

অর্থ: “আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তাঁরা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।” (সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

জান্নাত সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ কিছু কথা-কিছু স্মরণিকা

১) জান্নাত আমাদের কর্মফলের বিনিময় মূল্য নয়

আমাদেরকে কর্মফলস্বরূপ জান্নাত প্রদান করা হবে না। আমরা যতই আল্লাহর ইবাদত করি না কেন, তা কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের জান্নাত নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য নয়।

একটি গল্প আছে। আল্লাহ আলাম এর সত্যতা কতটুকু -যেহেতু এটি একটি ইসরাঈলী বর্ণনা, আমরা একে সত্যও বলব না, মিথ্যাও বলব না। ঘটনাটি হচ্ছে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিল যে বহুকাল যাবৎ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিল। শেষ বিচারের দিন তার সামনে পাহাড়সম নেক আমল উপস্থাপন করা হবে। ফেরেশতারা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, “তুমি কি তোমার নেক আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও, নাকি আল্লাহর রহমতের বরকতে?”

তখন সে তার আমলের পাহাড়ের দিকে তাকাবে আর বলবে, “আমি আমার কৃত আমলের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই।”

আল্লাহ তখন হুকুম করবেন ঐ লোকটির আমলের পাহাড়কে মীযানের এক পালায় আর আল্লাহর রহমতকে অপর পালায় স্থাপন করতে। যখনই আল্লাহর রহমতকে মীযানের এক পালায় রাখা হবে তখনই লোকটির পাহাড়সম নেক আমল বাতাসে উড়ে যাবে। যে রহমতের দৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঘিরে রেখেছেন, তা ঐ লোকটির সারা জীবনের সকল নেক আমলের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

যদিও সে ধারণা করেছিল যে, সে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি ইবাদতকারী একজন বান্দা। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে কি সে একবারও গুনাহ করে নি? সে কি বিশ্বাস নেয় নি? তার কি উত্থান-পতন হয় নি? যদিও সে আল্লাহর ইবাদতের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, তথাপি চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর রহমতে সে পরিবেষ্টিত ছিলো। কিন্তু নিশ্চয়ই সে প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা ইবাদতে কাটায় নি। এর সাথে তার কর্ণ, মন, সুস্বাস্থ্য, সম্পদ আর অন্যান্য নিয়ামত তো রয়েছেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, 'তাঁর নিজের আমলও তাঁকে জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না'। এই হাদীস বুখারীতে বর্ণিত।

তাহলে আমাদের কৃত আমলের ভূমিকা কি? সেটা নির্ধারণ করবে জান্নাতের কোন স্থানে আমরা দাখিল হবো। এজন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যতো বেশি সম্ভব নেক আমল সম্পাদনের চেষ্টা চালাবো।

জান্নাত সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয়

১) দৈহিক গঠন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ ষাট বিঘত (প্রায় ৩০ মিটার) উচ্চতাসম্পন্ন আদম আ. কে সরাসরি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ আকৃতিতে। ...সুতরাং জান্নাতে যারা প্রবেশিত হবে, তাদের সবার আকার-আকৃতি হবে হযরত আদম আ. এর ন্যায়। আদম সৃষ্টির পরবর্তীতে তাঁর থেকে উৎসারিত সন্তান-সন্ততি তথা মানবজাতির আকৃতি কালানুক্রমে হ্রাস পেয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে।” (সহীহ বুখারী, ৮/৭৪/২৪৬)

২) জান্নাতীদের বয়স

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে জান্নাতে প্রবেশিতদের বয়স হবে তেরিশ বছর।

৩) ঘুম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, “ঘুম মৃত্যুর দ্রাভস্বরূপ আর জান্নাতীরা ঘুমাতে না। সেখানে থাকবে বিরামহীন আনন্দ-কে সেখানে ঘুমাতে চাইবে?”

৪) জান্নাত আমাদের কল্পনার বাইরে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, সেখানে এমন সব নিয়ামত থাকবে যা কোন মানবচক্ষু কখনোই দেখে নি, কোন কান কখনোই শুনে নি এবং কোন হৃদয় কখনোই উপলব্ধি করতে পারে নি।

এই হাদীসে বলা আছে যে তিনি জান্নাত সম্বন্ধে বর্ণনা করেন এবং তারপরে বলেন, “তোমাদের চিন্তার পরিধি এই দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ।”

একজন জন্মান্তর ব্যক্তিকে আপনি যতই বলেন না কেন, দুধের রঙ সাদা, সে সাদা কি জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের চোখে সেটা দেখতে পাচ্ছে। একইভাবে আমরা যতক্ষণ নিজের চোখে জান্নাত না দেখতে পাচ্ছি, আমরা কিছুতেই এর সামান্যটুকুও কল্পনা করতে পারব না। এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন উদাহরণ এবং উপমা পেশ করেছেন যেন আমরা একে পাওয়ার জন্য আগ্রহী হই এবং শেষ পর্যন্ত নিজেরাই গিয়ে দেখতে সক্ষম হই, আসলে জান্নাত কিরূপ। আল্লাহ কবুল করুন, আমীন।

একবার কতিপয় নৃতত্ত্ববিদ একটি আদিম গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন। সেই গোত্রটি প্রচন্ড গরম জলবায়ুবেষ্টিত একটি এলাকায় বাস করতো। তাই তারা জীবনে কখনো তুষারপাত দেখে নি। সেই নৃতত্ত্ববিদরা তাদেরকে তুষারপাত কি রকম সেটার বর্ণনা দিতে লাগলেন ঐ এলাকার পরিবেশে বিদ্যমান বস্তুসমূহ দ্বারা যেগুলোর সাথে তারা পরিচিত ছিল। অতঃপর তাদের সামনে যখন তুষার দেখানো হলো, তারা সেটাকে চিনতে পারলো না। ঠিক তেমনি জান্নাতে প্রবেশ ব্যতীত আমরা কখনোই জান্নাতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবো না।

৫ জান্নাতে মলমূত্রত্যাগ বা ধুতু নিক্ষেপ অথবা অন্য কোন ধরনের বিরজিকর ব্যাপার থাকবে না

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾

অর্থ: “আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন।” (সূরা ইনসান ৭৬, আয়াত ২০)

আল্লাহর দানের কারণে আমরা হবো রাজার ন্যায়, আর বোনদের ক্ষেত্রে তারা হবে রানীর ন্যায় -ইনশাল্লাহু। আল্লাহ বলেছেন,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

অর্থ: “কেউ জানে না, তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।” (সূরা সাজদা ৩২, আয়াত ১৭)

জান্নাত বনাম দুনিয়া

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন:

﴿وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾

অর্থ: “আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিবজীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।” (সূরা ত্বাহা ২০, আয়াত ১৩১)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -যিনি ছিলেন সম্পদ ও আড়ম্বরহীন, আল্লাহ তাকে বলছেন যে অন্যকে তিনি যে সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী দিয়েছেন, সেগুলোর দিকে দৃকপাত না করতে। তাদের অট্টালিকা, বাগান আর সম্পদের দিকে না তাকাতে, কারণ আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম।

আমেরিকায় একটি প্রোগাম আছে যেটাতে তারা আপনাকে বিখ্যাত ও সম্পদশালী ধনাঢ্যদের বিশাল প্রাসাদ ও বিলাসবহুল বাড়ীতে নিয়ে যায়। বর্তমানে এ ধরনের বহু অনুষ্ঠান আছে, যেগুলোতে বিত্তশালী ব্যক্তিদের জীবন, বিলাসিতা ইত্যাদি হাইলাইট করা হয়, একজন মুসলিম হিসেবে আমরা সতর্ক থাকবো, যেন আমাদের অন্তর এগুলোর প্রতি এটাচড না হয়ে যায়। কেননা আমরা আমাদের অন্তরকে দুনিয়ার মোহে আসক্ত করতে চাই না।

সবশেষে এখন আমরা কিছু তুলনামূলক আলোচনা করবো। এই দুনিয়ার সাথে আখিরাতের কয়েকটি বিষয়ের তুলনামূলক চিত্র-কন্ড্রাস্ট আমরা তুলে ধরছি, ইনশাআল্লাহ। যে চারটি বিষয়ে আমরা কথা বলতে চাই সেগুলো হচ্ছে-

১ সংখ্যাগত পরিমাণ বা কোয়ানটিটি

২ গুণগত পরিমাণ বা কোয়ালিটি

৩ জান্নাত বিশুদ্ধ, দুনিয়া দূষিত

৪ জান্নাত চিরস্থায়ী, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী

অন্যতম এই চারটি বিষয়ের কারণে জান্নাত, দুনিয়া থেকে উত্তম।

১. পরিমাণ-কোয়ানটিটি-বা প্রাচুর্য। জান্নাতে সবকিছুর প্রাচুর্য হবে মিনিমাম এই দুনিয়ার দশগুণেরও অধিক। আল্লাহ বলেছেন:

﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾

অর্থ: “(হে রাসূল) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাণ ও খর্ব করা হবে না।” (সূরা নিসা ৪, আয়াত ৭৭)

‘ক্বালীল’ শব্দটিকে এখানে ‘সংক্ষিপ্ত’ হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে, কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে তার মর্মার্থ হল যে পরিমাণে খুবই অল্প। আল্লাহ জান্নাতে যা রেখেছেন তা অনেক ব্যাপক। সবার শেষে যে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার কাছে এই দুনিয়ার দশগুণ পরিমাণ থাকবে।

২. গুণগত মান কোয়ালিটি। বুখারীতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে একটি চাবুক পরিমাণ জায়গার মান হবে পুরো দুনিয়া ও এর মধ্যস্থিত যাবতীয় সামগ্রীর চেয়ে উত্তম।” (বুখারী:৮/৭৬/৪২৪)

সেই জায়গা কতটুকু স্থান দখল করবে? এক ইঞ্চি বা এক ফুট? সুতরাং, ঐ পরিমাণ জায়গার মালিক যদি আপনি জান্নাতে হন, তাহলে সেটার মূল্য এই পুরো দুনিয়ার চাইতেও বেশি। জান্নাতে দূরত্বের পরিমাণ হিসাব করা হবে আলোক বর্ষের স্কেলে।

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَنَسَةَ بِنْتِ أُمِّ حَازِمٍ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي الْمُسْتَوْرِدُ أَخُو بَنِي فَهْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ আরো বলেছেন: “আল্লাহর শপথ, দুনিয়ার সাথে আখিরাতের তুলনা এরকম, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার আঙুল (এটা বোঝানোর জন্য তিনি তাঁর তর্জনী নির্দেশ করছিলেন) ডুবিয়ে বের করার পর যে সামান্য পানিটুকু লেগে থাকে, দুনিয়া আখিরাতের নিকট সেরকমই নগণ্য।” (মুসলিম, হাদীস নং ৬৮৪৩)

দুনিয়া আখিরাতের নিকট এক ফোঁটা পানির ন্যায় নগণ্য। আমরা সেই এক ফোঁটা পানির জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হানাহানিতে লিপ্ত। আমরা এক ফোঁটা পানির জন্য আমাদের দ্বীনে অবহেলা করছি। যদি সবাইকে প্রতিদিন ভোরে ফজরের নামাযে আসার জন্য ৫০০ টাকা করে দেয়ার অঙ্গীকার করা হতো, তাহলে মসজিদ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। এই ৫০০ টাকা কি জান্নাতের চেয়েও বেশি দামি? আসলে আমরা ভুল জিনিসের পিছনে ছুটছি, আমরা ভুল জিনিসের দাম নিয়ে দর কষাকষি করছি!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না। আমরা দুশ্চিন্তা হলো যে তোমরা সম্পদশালী হবে, আর যখন তোমরা সম্পদশালী হবে তখন তোমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির ন্যায়। আর এটা তোমাদের ধ্বংস করবে, ঠিক যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।”

عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضأت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحاً، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها.

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের একজন নারী যদি পৃথিবীতে আসতো, তাহলে আসমান-জমিন আলায় ভরে যেতো। আসমান জমীনের মধ্যবর্তী অংশ সুস্রাণে ভরে যেতো আর সেই নারীর মাথার দোপাট্টা এই পৃথিবী আর তার

ভেতর যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতেও উত্তম।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৬৮)

৩. জান্নাত পবিত্র, দুনিয়া কলুষিত

জান্নাতের সবকিছুই পবিত্র। অন্যদিকে দুনিয়ার সবকিছুই কলুষিত। দুনিয়ার সবকিছুই পঙ্কিল, নাপাকযুক্ত -এমনকি আপনি যেটাকে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ভাবেন সেটাও। দুনিয়াতে absolute বা চূড়ান্ত আনন্দ বা চূড়ান্ত তৃপ্তি বলে কিছু নেই, দুনিয়ার সবকিছুরই কিছু না কিছু সাইড ইফেক্ট বা ত্রুটি আছে। দুনিয়ার কোন কিছুই পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ নয়।

চলুন দেখা যাক কিছু জিনিস, যেগুলোকে আমরা আনন্দদায়ক ভাবি-উদাহরণস্বরূপ খাদ্যের কথাই ধরুন। এক মুহূর্তের জন্য ভাবুন আপনার পরিপাকতন্ত্র আপনার সামনে স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত করে দেয়া হলো আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন একবার খাবার মুখে যাওয়ার পর কি অবস্থা হয়।

আপনি দেখছেন খাবার লালার সাথে মিশ্রিত হচ্ছে, রং পরিবর্তন হচ্ছে। আপনি দেখতে পাবেন এটা আপনার পেটের মধ্যে গিয়ে তরলের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে। কেমন হয় যদি আপনি একই সাথে গন্ধও পান?

যখন বদহজম হয়, তখন এই বাজে গন্ধের ব্যাপারটা আপনারা বুঝতে পারেন। এই পুরো পরিপাক ক্রিয়া দেখার পর আপনি পরবর্তীতে কারো সাথে বসে কখনোই খাওয়ার চিন্তা করবেন না!

এতদসত্ত্বেও আমরা খাবার ভালোবাসি, যদিও আত্যন্তরীণভাবে সেটা একটা বিভীষিকাময় প্রক্রিয়া। যেমন- অনেকেই মাইক্রোস্কোপে দই দেখার পর, কিভাবে তার ওপর জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা দেখার পর চিরদিনের জন্য সেটা খাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

আমরা ছবি কল্পনা না করে যদি চিন্তা করি, প্রজনন পদ্ধতির কথাই ধরুন, শুধু পদ্ধতিটা একবার ভাবুন। যদি আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি না করে দিতেন, তাহলে কেউই এ ধরনের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চাইত না। পুরো ব্যাপারটাই হতো নিদারুণ বিতৃষ্ণাময়।

ইবনুল জাওযি চূষন সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন- ‘যদি মানুষ এটা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে চিন্তা করত, তারা কখনোই তা করত না’। সুতরাং, এটাই হলো দুনিয়া। দুনিয়ার সবকিছু মুখোশে ঢাকা। যখনই আপনি সেটা খুলবেন, তখন দেখতে পাবেন ভেতরে সেটা কতো পঁচা।

আসুন জান্নাতে আছে আবার দুনিয়াতেও আছে, এমন চারটি উপাদানের মধ্যে তুলনা করা যাক। সেই চারটি জিনিস হচ্ছে- মদ, পানি, দুধ, মধু।

১-মদ -দুনিয়ার মদ বিশুদ্ধ নয়। তাতে নানা ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত থাকে। অপরদিকে আল্লাহ জান্নাতের মদ সম্বন্ধে বলেন,

﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾

অর্থ: “তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না।” (সূরা সাফফাত ৩৭, আয়াত ৪৭)

২-পানি -যদি পানি কোথাও দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকে তাহলে সেখানে শৈবাল জন্মায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন যে জান্নাতের পানি হবে দূষণ মুক্ত।

৩-দুধ ফ্রিজের বাইরে গরমে কিছুক্ষণ রাখলে তা নষ্ট হয়ে যায় ও তেঁতো হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেছেন যে জান্নাতের দুধ কখনোই পরিবর্তিত হবে না।

৪-মধু -মধুর একটা সমস্যা হলো যে এটা বিশোধন করা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। আল্লাহ বলেন যে জান্নাতের মধু আপনার জন্য পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেয়া হবে।

আল্লাহ জান্নাতে চারটি নদীর কথা বলেছেন যেগুলোর মালিকানা হবে আপনার আর সেগুলো হবে পবিত্র। আপনার সাথীরা হবেন পবিত্র। দুনিয়াতে মহিলারা যেসকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অতিক্রম করেন যেমন-ঋতুচক্র, সন্তান জন্মদান পরবর্তী অসুস্থতা ইত্যাদি -সেগুলোর অস্তিত্ব জান্নাতে থাকবে না।

উপরন্তু তারা হবেন একটি বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারিণী, অনেক মানুষ বাহ্যিকভাবে সুন্দর কিন্তু তাদের অন্তর দূষিত, এ ধরনের সৌন্দর্য অর্থহীন, কিন্তু আপনার জান্নাতের সাথীরা তাদের অন্তরের পাপাচার ও কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। হৃদয়সমূহ হবে কেবল একটি মাত্র মানব হৃদয়ের ন্যায়।

আল্লাহ এই পৃথিবীতে আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কেবল সামান্য, এক ঝলকের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয়সমূহ থাকবে কেবল আখিরাতে। আসল বাস্তবতা হল আখিরাতে।

নার বা আগুন সম্পর্কে

আমাদের সবাই আগুনের যন্ত্রণা সহ্য করেছি -হয়তবা গরম পানির ভাঁপে, নয়ত ফুটন্ত তেলের ছিঁটায় অথবা উন্মুক্ত অগ্নিশিখার তাপে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সবাইকে আগুনের যন্ত্রণার স্বাদ পাইয়েছেন আসল অগ্নির হুঁশিয়ারি হিসেবে।

এটা আমার একটি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, আমি এমন কোন মানুষ পাই নি যারা জীবনে কখনো আগুনের জ্বালা অনুভব করেন নি।

৪. জান্নাত চিরস্থায়ী, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী

দুনিয়াতে যদিও বা কোন আনন্দ থেকে থাকে, তাহলে সেটা হয় ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতে তা হবে চিরস্থায়ী। দুনিয়ায় যদি আপনি খাবার ভালোবাসেন, আপনি এক নাগাড়ে খেতে পারবেন না, কারণ তাহলে আপনার স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিবে।

এই পৃথিবীতে আপনি দেখবেন যে যারা চমকপ্রদ খাবার কেনার সামর্থ্য রাখে, তারা সেটা খেতে পারে না -তাদের উচ্চ কোলেস্টেরল সমস্যাসহ ইত্যাদি নানা সমস্যা রয়েছে।

জান্নাতের সবকিছুই চিরস্থায়ী। আপনি চাইলেই আপনার নদীর সবটুকু পানি পান করতে পারবেন। আপনার পছন্দসই ফলমূল ও গোশত পেতে পারেন। আপনি আপনার স্ত্রী কর্তৃক বছরের পর বছর যাবৎ আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

দুনিয়াতে মানুষ এই সামান্য সময়ের আনন্দের জন্য অনেকে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, অথচ এই সকল আনন্দ সাময়িক। এর কতো কুফল রয়েছে। এর ফলে পরিবারে অশান্তি এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটছে। ব্যভিচারের শাস্তি হল প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু।

সুবহানাল্লাহ্। তারা সাময়িক ফুর্তির জন্য এই ধরনের ভয়ংকর শাস্তির মধ্য দিয়ে যাবে। আখিরাতে তার শাস্তি হবে চিরকাল। দুনিয়ার সবকিছু ক্ষণস্থায়ী আর আখিরাতে সবকিছুই চিরস্থায়ী।

জান্নাত ও জাহান্নামের এই বর্ণনা শোনার পর, পরকালের পথে যাত্রার এই ভ্রমণ শেষে আমাদের উচিত নিজেদের কাছে এই মর্মে অঙ্গীকার করা যে, আমরা যেনো সর্বদা তা স্মরণে রাখি এবং এ নিজেদের জীবনে এ বিষয়ে আলোকপাত করি।

যদিও আমরা দুনিয়ার বুক চলাফেরা করছি, তারপরও আমাদের উচিত আখিরাতে স্মরণ সাথে নিয়ে এই পৃথিবীতে বাস করা।

আর আমাদের উচিত সর্বদা দু'আ করা। আসুন আমরা সিজদারত অবস্থায়, রাতের সালাতে, দু'হাত উপরে তুলি দু'আর জন্য। আসুন আমরা কুরআনে বর্ণিত দু'আগুলো দ্বারা প্রার্থনা করি। জাহান্নামের অগ্নি থেকে পানাহ চাইতে থাকুন এবং জান্নাতের জন্য দু'আ করুন। মহান আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করুন। আমীন।

The Hereafter বা পরকাল সিরিজের শেষ পর্ব

‘জান্নাত ও জাহান্নাম’

এখানেই সমাপ্ত। এই সিরিজের ১ম পর্ব-

‘পরকালের পথে যাত্রা’

এই সিরিজের ২য় পর্ব-

‘দাজ্জাল, মহাপ্রলয় ও বিচার দিবস’



...কিছু বই, বদলে দেয় ব্যক্তি ও সমাজকে; কিছু বই, বদলে দেয় সারা বিশ্বকে
শুধু বই নয়, আমরা বিনির্মাণ করি রুচিশীল চিন্তা ও মনন



(নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় অঙ্গীকারবদ্ধ)

দোকান নং ৩৮, ১ম তলা, ইসলামী টাওয়ার
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল: ০১৭৪০১৯২৪১১
Email: ishak.khan40@gmail.com
www.lighthouse24.org

Hereafter-3

জান্নাত ও জান্নাম



মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান

সংকলন ও সম্পাদনা



The Hereafter

জান্নাত
ও
জান্নাম

সংকলন ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান